প্রান্তিক জন চর্চা গ্রন্থমালা

৭

বাংলার শ্রমিক: কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পাঞ্চল

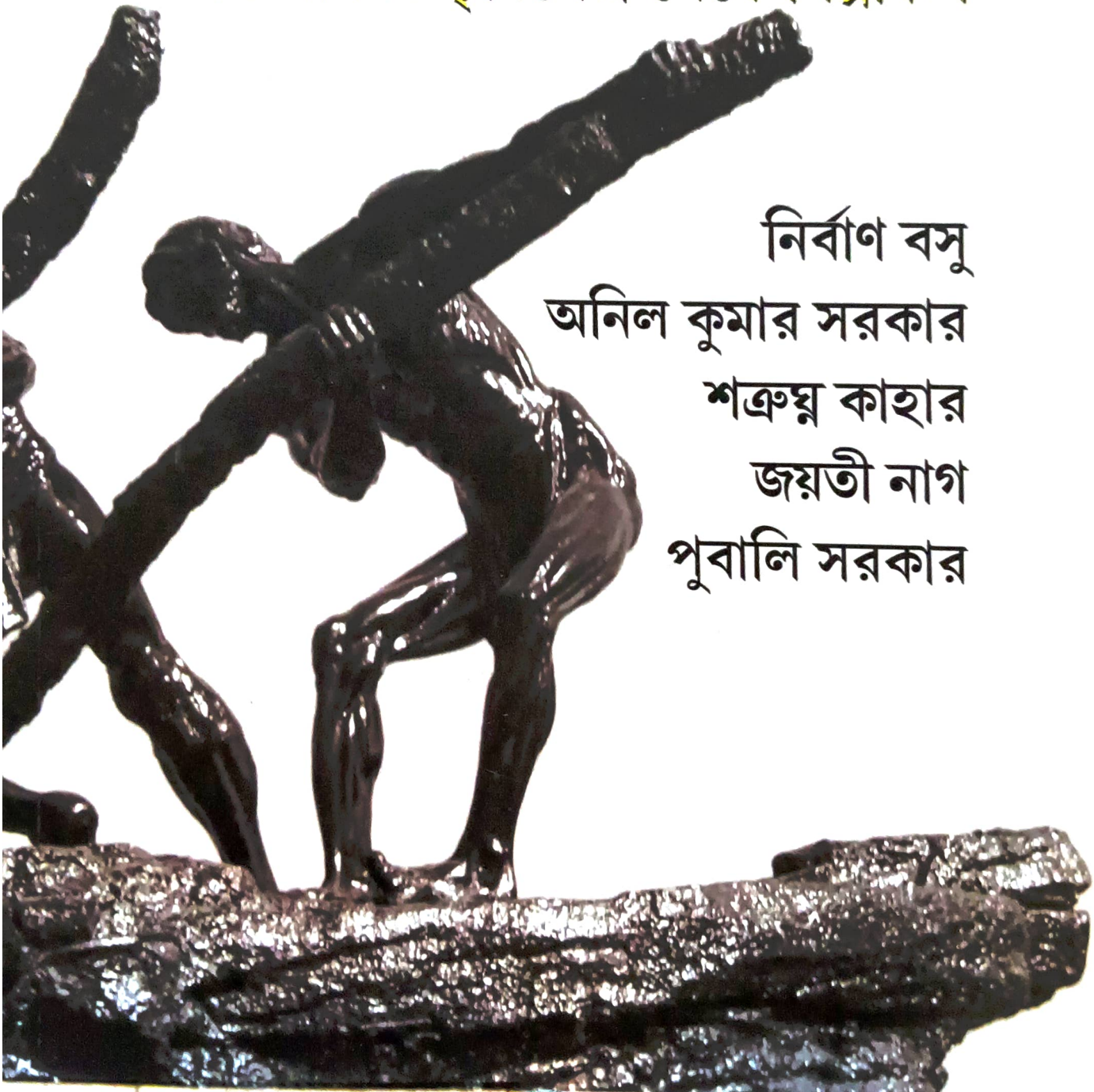

নির্বাণ বসু

অনিল কুমার সরকার

শত্রুঘ্ন কাহার

জয়তী নাগ

পুবালি সরকার

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল

কলকাতা - ৭০০০৮৪

বাংলার শ্রমিক: কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পাঞ্চল

(প্রান্তিক জন চর্চা গ্রন্থমালা)

সপ্তম খন্ড

নির্বাণ বসু
অনিল কুমার সরকার
শত্রুঘ্ন কাহার
জয়তী নাগ
পুবালি সরকার

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল
কলকাতা ৭০০০৮৪

প্রকাশক
গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল
৪৪৫ – শ্রীরামপুর রোড (পূর্ব), গড়িয়া
কলকাতা ৭০০০৮৪

মুদ্রাকার
গ্রাফিক প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিসিটি
৩এ, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট
কলকাতা ৭০০০৫৪

সপ্তম খণ্ড
প্রথম সংস্করণ : ১২ ই আশ্বিন, ১৪৩৩ (ইং. ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)

প্রচ্ছদচিত্র
"Triumph of Labour" by Debi Prasad Roy Chowdhury, 1959. Located in Marina Beach, Chennai, India. Licensed under CC BY-SA, 3.0. Retrieved from Wikimedia Commons.

মূল্য - ১৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

প্রাক্-কথন ৭-১০

ইস্পাত শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ: প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার কুলটি-হীরাপুর শিল্পাঞ্চলের একটি সমীক্ষা

নির্বাণ বসু ১১-২৮

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম ও লিঙ্গ বৈষম্য

অনিল কুমার সরকার ২৯-৪২

কৌম, শ্রেণী ও ব্যক্তিসত্তা অনুসন্ধানে শ্রমিক পরিচয়: প্রসঙ্গ চটকল শ্রমিক

শত্রুঘ্ন কাহার ৪৩-৮৮

বাংলার রেল কর্মচারী ও শ্রমিক, ১৯০৬-১৯৭৪

জয়তী নাগ ৮৯-১২৩

চায়ে পে চর্চা: চা প্ল্যান্টেশন, লিঙ্গবৈষম্য, এবং অবসর যাপন

পুবালি সরকার ১২৪-১৫১

কৌম, শ্রেণী ও ব্যক্তিসত্তা অনুসন্ধানে শ্রমিক পরিচয়: প্রসঙ্গ চটকল শ্রমিক

শত্রুঘ্ন কাহার

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা তথা ভারতে শিল্পায়নের প্রসার ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারতীয় ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচক ছিল। প্রথমদিকে ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত সমাজ এই নবউদিত শ্রমজীবী শ্রেণিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও ক্রমে তারা উপলব্ধি করে যে আধুনিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণি এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিশেষত বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শ্রমিকদের ঘিরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে শ্রমিক শ্রেণির জীবন, সংগ্রাম, সংগঠন ও রাজনৈতিক ভূমিকা ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রমিকদের সামাজিক গঠন, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আন্দোলনের চরিত্র, রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসচর্চায় নানান বিতর্কের সূচনা হয়।

কিন্তু এতাবৎকাল সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, শ্রেণী ও কৌম চেতনার আলোকে শ্রমিক সত্তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই দুই চেতনার বাইরে মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বার্থ (inherent personal interest) প্রতিটি শ্রমিকের আচরণের পেছনে কাজ করেছে যা এতদিন ঐতিহাসিকদের কাছে অনেকটাই অধরা থেকে গেছে। বস্তুত শ্রেণী ও কৌম চেতনার পাশাপাশি এই ব্যক্তি চেতনাকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পরিচিতি সত্তা নির্ভর রাজনীতি (Identity Politics) নব্য উদারীকরণ যুগে সারা বিশ্ব জুড়েই রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে উঠেছে। ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে এর তেমন কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৮০র দশক থেকেই তা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের (Globalisation) সঙ্গে তা যুক্ত হয় এবং তাত্ত্বিকক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post modernization) স্বীকৃতি দেয় পরিচয়ের সত্তাকে, মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বের বহুত্বকে এবং তাকে খাড়া করা হয় মার্কসীয় শ্রেণী তত্ত্বের বিরুদ্ধে। ভারতের ক্ষেত্রে জাতপাত (caste), ধর্মচেতনা (religion), ভাষা (language), জাতিগোষ্ঠী (ethnicity), সম্প্রদায়গত (community) বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে

পরিচিতি সত্তার রাজনীতি, যাকে তুলে ধরা হয় মার্কসীবাদী শ্রেণী ভিত্তিক ধারণার বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতে ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের বক্তব্য হল যে, এই ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণী ভিত্তিক রাজনীতিকে তুলে ধরতে হবে।[১]

শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা বা প্রত্যয়ই হল মার্কসবাদের মূল কেন্দ্রভূমি, যা উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণী চেতনা সর্বহারা শ্রেণী কখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রয়োগ করতে পারে না, তাকে বাইরে থেকে আয়ত্ত করতে হয়। লেনিনবাদের মূল ভিত্তি হিসাবে একথা স্বীকৃত যে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে থাকে ট্রেড ইউনিয়ন চেতনা বা প্রাথমিক শ্রেণী চেতনা কিন্তু প্রকৃত শ্রেণী চেতনা গড়ে তুলতে হলে লাগবে সংগ্রামী একটি কমিউনিস্ট পার্টি। অবশ্য লেনিনের সমসাময়িক আর এক বিখ্যাত মার্কসীয় চিন্তাবিদ ও লেখিকা রোজা লুক্সেমবুর্গ জোর দিয়েছিলেন শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) শ্রেণী চেতনার উপর। লেনিনীয় পার্টি ধারণার সমালোচনা করে তিনি সজোরে বলতে চেয়েছিলেন যে সর্বহারা শ্রেণী তাদের নিজস্ব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই রাজনৈতিক চেতনা অর্জন করে থাকে।

তৎকালীন যুগে গোঁড়া মার্কসবাদীদের কাছে রোজার বক্তব্য গৃহীত হয়নি। কিন্তু ১৯৮০র দশকে সোভিয়েত ব্যবস্থা পতনের পর শ্রেণী বনাম রাষ্ট্রশক্তি বনাম ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে থাকে। অর্থনীতিভিত্তিক শ্রেণীর বদলে বিভিন্ন পরিচিতি সত্তাকে কেন্দ্র করে মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং এখান থেকেই উঠে আসে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শুধু শ্রেণী নয়, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর (individuality versus collectivity) সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রশ্ন। ভারতের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে এই সমস্যামূলক প্রশ্নটি আরও জটিল হতে বাধ্য। ধ্রুপদী মার্কসবাদী চিন্তায় অর্থনীতিভিত্তিক শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে অন্যান্য সমাজ সম্পর্কিত সংগ্রামগুলিকে অঙ্গীভূত করে মিলিয়ে তুলতে হবে। সেটা শ্রমসাধ্য ও দুরূহ হলেও সেটাই হবে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র নির্ধারক শক্তি।

ভারতীয় গোঁড়া মার্কসবাদীদের মতে একথা সত্য নয় যে, মার্কসবাদে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল, কিন্তু এবিষয়ে স্পষ্ট বা গভীরভাবে তিনি কোনও আলোচনা করেননি এটাও সত্যি কথা। প্রভাত পট্টনায়কের মত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক স্বীকার করেছেন যে, দেশে যদি কর্মহীনতা ও বেকারী থাকে, তাহলে প্রতিটি বেকার শ্রমিকই তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং সংগতভাবেই কাজ পেতে চাইতে পারে এবং দরকার হলে বর্তমান শ্রমিকদের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে পারে। এখানে শ্রেণী বা গোষ্ঠী স্বার্থের চাইতে ব্যক্তি স্বার্থই বড় হয়ে দেখা দিতে বাধ্য।[২] ২০১৭ সালে প্রকাশিত সি.পি.আই. এম. দলের এক অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার মধ্যে গোড়া থেকেই নানাধরনের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্গামিতা (backward linkages) ক্রিয়াশীল ছিল। পরবর্তীকালে নব্য উদারনীতিবাদ নানাভাবে

শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল অংশকে প্রভাবিত করে এই প্রবণতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। একই সঙ্গে সুকৌশলে ভোগবাদী চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে (consumerism)। তার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বস্তুগত (materialistic) আশা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সেই আশা আকাঙ্ক্ষা রুপায়নের আর্থিক ক্ষমতা তাদের নেই। পাশাপাশি ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে (চটকল শ্রমিক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ) অসম বৈশিষ্ট্য প্রচণ্ডভাবে (variations) বর্তমান, যেগুলি মোটেও ক্ষণস্থায়ী নয়। সব কিছু মিলিয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের ধারই শুধু কমেনি, বৃহত্তর জনসমাজে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বও কমে গেছে।[৩]

নবীন মার্কসবাদী ইতিহাস গবেষক শুভ বসুর বক্তব্যটিও এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে the class is always in the process of making and unmaking. Itself the notion of class is neither fixed nor given. Indeed, the class matters but not always in a way many historians have imagined in the Indian context.[৪]

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তির সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অমর্ত্য সেন। তাঁর মতে বহুল প্রচলিত এই ধারণা যে মার্কস ইতিহাসকে একধরনের একমাত্রিক বস্তুবাদী ধারণার মধ্যে বেঁধে রেখেছিলেন তা নয়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত গোথা প্রোগ্রাম সম্পর্কে মার্কসের Critique of Gotha Programme একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। গোথা প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাঁর একটি প্রধান সমালোচনা ছিল যে, একজন ব্যক্তি মানুষকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। যখন কমিউনিস্টরা সমাজের সমস্ত সদস্যদের সমানাধিকার দাবি করেন, তখন তারা প্রত্যেককে কেবল শ্রমিক হিসাবেই দেখেন এবং সেই কারণে শ্রমের ফলেই তার অধিকারকে সীমিত রেখে দেন। কিন্তু মার্কস মনে করেন যে, এতে একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে গেছে, সেটা এই যে একজন মানুষ শ্রমিক হতে পারেন কিন্তু কখনই একজন ব্যক্তি যে শ্রমিক এটাই তার একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে গোথা প্রোগ্রামে মানুষকে শুধুমাত্র শ্রমিক হিসাবে দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে আর কিছুই দেখা হয়নি, অন্য সবধরনের পরিচয়কে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন মার্কসের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি অবহেলিত থেকে গেছে এবং মার্কসীয় চিন্তার জটিল বহুমুখীনতা বাদ দিয়ে মার্কসবাদকে কিছু শ্লোগানের সমষ্টিতে পরিণত করা হয়েছে।[৫]

মার্কসের এই উদারনৈতিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরিচয় থাকলে পরবর্তীকালের Identity politics এবং ব্যক্তিসত্তার সমর্থক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মার্কসীয় বিতর্ক অনেকটাই কমে আসে। এই বক্তব্যের সঙ্গে সাবলটার্ন শ্রমিক ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্যের খুব একটা সম্ভবত তফাৎ নেই, চক্রবর্তীর মতে আমাদের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটা মূল সমস্যা হল চেতনার (consciousness) সমস্যা। এঙ্গেলস যখন বলেন যে economy determines consciousness only in the last instance, তখন তিনি শিল্পোন্নত

দেশের কথা মনে রেখেই বলেন। কিন্তু ভারতের মত দেশে যেখানে শিল্প কম, শ্রমিক সংখ্যা অল্প এবং তা পুরোপুরি শিল্প শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়নি, অনেক দিন পর্যন্ত অর্ধ-কৃষক অর্ধ-শ্রমিক এই দ্বৈত চরিত্র বজায় রেখেছে তাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অর্থনীতি সব কিছু নির্ণয় করে না। রণজিৎ গুহের মতে চেতনাকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে না। সেই রকম Identity বা পরিচিতিও কিন্তু স্থাণু (static) নয়। কাজেই পরিচিতি সত্তারও একটা বহুমুখীনতা রয়েছে।[৬]

শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কৌম (communitarian) বা শ্রেণীর (class) ধারণার সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচিতি থাকলেও, শ্রমিকদের ব্যক্তিসত্তা ইতিহাসে তেমন আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি লিঙ্গ, ভাষা, আঞ্চলিকতার মত আধুনিক বিষয় শ্রমিক ইতিহাসচর্চার অঙ্গীভূত হলেও, ব্যক্তিচেতনা ব্রাত্যই থেকেছে। বিপান চন্দ্র তাঁর 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু মধ্যশ্রেণীগুলির সে সমস্ত ব্যক্তি ও শাখাসমূহ ব্যাপকতর সামাজিক দিশা বা জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলনসমূহ কর্তৃক যুক্তিগ্রাহ্য কালের মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাবার ক্ষমতায় আস্থা ছিল না, তারা যখন তাৎক্ষনিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াত, তখন তারা ব্যক্তিগত সমস্যার স্বল্পমেয়াদী সমাধান খুঁজত, সংকীর্ণ তাৎক্ষনিক স্বার্থ দেখত।'[৭] প্রশ্ন হল কথাটি কি শুধু মধ্যশ্রেণীর জন্যই প্রযোজ্য? উত্তর সম্ভবত না। সেই আদিমকাল থেকেই মানুষের দলবদ্ধ হওয়া, সমাজ গঠন, নিয়ম নীতি প্রণয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনীয়তা বা স্বার্থ কাজ করেছে। শ্রমিকরাও রক্তে-মাংসে তৈরি মানুষ। তাদের মধ্যেও মানুষ সুলভ সমস্ত চরিত্র বর্তমান। সুতরাং ব্যক্তি স্বার্থও জন্মগতভাবেই তাদের চরিত্রের অংশ এবং একজন মানুষ হিসাবে তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে, সে স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই স্বার্থের উপর নির্ভর করেই তাদের ভিন্ন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগের শেষদিকে বাংলা তথা ভারতে শিল্পায়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ছিল। প্রথম দিকে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ এই নতুন শ্রেণীকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও, তারা ক্রমে বুঝতে সক্ষম হয় যে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এরা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই শ্রমিক শ্রেণীদের নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় শ্রমিকদের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল ভারতীয় বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদের এই শ্রমজীবীদের সংগঠিত করে আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রমে এই শ্রমজীবীদের কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিকরা এই শ্রমজীবীদের গঠন, উপাদান, কার্যপদ্ধতি, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যাবলীকে একটা নিয়মাবর্তিত তাত্ত্বিক অবকাঠামোয় ফেলে বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

বিংশ শতকের ভারতীয় শ্রমিকদের নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে জানকী নায়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন যা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, 'ধর্মের (কিংবা ভাষা, বর্ণ বা জাতি প্রভৃতি অ-শ্রেণী পরিচয়ের) প্রতি আনুগত্য কি শুধুই অপরিণত পুঁজিবাদী (কারণ তা ঔপনিবেশিক) অর্থনীতিতে পরিবর্তনমানতারই নজির? তাহলে কি শ্রমিক শ্রেণী যখন কারখানা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতায় পোড় খাবে, তার সামনে বিকল্প সাংগঠনিক কাঠামো হাজির হবে, তখন এই আনুগত্যের টান দুর্বল কিংবা অন্তর্হিত হবে? নাকি ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ কিংবা ভাষার প্রতি এই আনুগত্য নিছকই কৃষক চৈতন্যের অবশেষ নয়, বরং অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ও পাকাপোক্ত একটি 'আদিম আনুগত্য' যা নতুন শহরে জীবনযাপনের দিশা দেখায়?'[৮] এই প্রশ্নগুলির পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রশ্ন সংযোজন করা যায়, যেমন যেকোন চৈতন্য উদ্ভবের প্রেক্ষাপট তার পারস্পারিক পরিস্থিতির উপর কতটা নির্ভর করে? পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের চৈতন্যের মধ্যে পরিবর্তন কি সম্ভব? একই সঙ্গে শ্রমজীবীদের মধ্যে একাধিক চৈতন্যের সমাহার কি থাকতে পারে? সেই আদিম লগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। গোষ্ঠী চেতনার উদ্ভব নতুন কোন বিষয় নয়। জন্তুজানোয়ারের আক্রমণ তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা যে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেই করা সম্ভব, তা তারা সেই আদিম যুগেই উপলব্ধি করেছিল। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তি স্বার্থ তাদেরকে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে আধুনিক সামজে পরিণত হয়, তখন দেখা যায় এরা সামজের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে একটি সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে। রুশোর ভাষায় স্বাধীন হয়ে জন্মেও শুধু নিজের কল্যাণার্থে মানুষ নিজেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।[৯] উনিশ শতকে শিল্পায়নের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান গোষ্ঠী চেতনার পাশাপাশি এক নতুন চেতনার উন্মেষ আমাদের কাছে তুলে ধরে। একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অসহনীয় শোষণ ও অত্যাচার তাদেরকে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে সামিল হতে বাধ্য করে। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন তাদের শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, শ্রেণী চৈতন্য না কৌম চৈতন্য কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রমজীবীদের জীবনে?

বিষয়টির উত্তর খুঁজতে হলে ভারতীয় সমাজে এই শ্রমজীবীদের উত্থান, তাদের পারস্পারিক পরিবেশ, তাদের অভিযোজন ক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা দরকার। ভারতের ইতিহাসে এই শ্রমজীবীদের উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। তবে একটি দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই শ্রমজীবীদের উত্থান ঘটলেও, এদের চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে এক সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলেও, বাংলায় আরও স্পষ্ট করে বললে ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। ভারতে প্রথাগত অর্থে শিল্পবিপ্লব কোনোদিন হয়নি, ইংল্যান্ডের অনুসারী রাষ্ট্র হিসাবেই ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটে। ঊনবিংশ শতেকের মধ্যভাগের পর থেকে ভারতে কৃষি নির্ভর শিল্পের প্রসার ঘটতে শুরু করে। যেমন পাট

কেন্দ্রিক চটশিল্প, চা-কফি কেন্দ্রিক বাগিচা শিল্প দ্রুত আন্তর্জাতিক বাজারে খ্যাতি লাভ করে।[১০] এই সময়পর্বে বিদেশী পুঁজির হাত ধরেই ভারতে শিল্পের প্রসার ঘটলেও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পে সক্রিয় দেশীয় পুঁজির নিবেশ হওয়া শুরু করে। এই সময় লৌহ-ইস্পাত শিল্প, সুতাকল শিল্প, চিনি শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির প্রবেশ ঘটে। যদিও ভারতে শিল্পে কোনোদিন বিপ্লব ঘটেনি, তবুও শিল্পের প্রসার ভারতের চিরাচরিত সামজব্যবস্থার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ছিল বর্ণভিত্তিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ঊনবিংশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে চিরাচরিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার তার বাণিজ্যিক সুবিধার্থে যে সমস্ত নীতি প্রনয়ণ করে, তা এই সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে। তাদের বাণিজ্যিক নীতি ভারতীয় কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে, যার ফলে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে তাদের গৃহীত ভূমিরাজস্ব নীতি অতিরিক্ত এই কর্মহীন জনসমাজকে কৃষিকাজের দিকে ঠেলে দেয়। কৃষির ওপর এই অত্যাধিক চাপ কৃষক জীবনে এক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়।[১১] তারা এই অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন ব্রিটিশ পুঁজির আনুকুল্যে ভারতে শিল্পায়নের প্রসার ঘটে।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে, আরও স্পষ্ট ভাবে বললে ব্রিটেনে শিল্পের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে, কিন্তু তার তরঙ্গ ভারতে পৌঁছাতে আরও একশত বছর নিয়েছিল। এই পর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোন ভারী শিল্প গড়ে তুলতে না চাইলেও, কিছু কৃষি নির্ভর অনুসারী শিল্প গড়ে তোলে। এই শিল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরই ফলস্বরূপ দেখা যায় ভারতীয় রেলওয়ের সম্প্রসারণ। ভারতীয় রেলওয়ের সম্প্রসারণ ভারতীয় শিল্পায়নের চরিত্রকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। প্রত্যন্ত গ্রামের সাথে শিল্পনগরীর সংযোগ ঘটে, অবশিল্পায়নের ফলে কর্মহীন শিল্পীরা নতুন কর্মসংস্থানের সন্ধান পায়। শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

১৮৫৫ সালে রিষড়ায় বাংলার প্রথম চটকল স্থাপনের পর প্রায় প্রথম দুই দশক মূলত স্থানীয় শ্রমিকরাই এই শিল্পে শ্রমের চাহিদা মেটাত। কিন্তু কালক্রমে ১৮৮০ এর দশক থেকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে বিশেষত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, আন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দলে দলে শ্রমিকরা এই শিল্পে যোগ দেয়।[১২] ১৮৮০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই শ্রমিকরা মূলত অভিবাসী শ্রমিক হিসাবেই বাংলার চটকলগুলিতে কাজ করত। অবসরের পর তারা নিজ নিজ গ্রামে (তাদের ভাষায় দেশে) ফিরে যেত। মূলত শ্রমিকরা পরিবারহীন একাকী জীবনযাপন করত এই 'পরদেশে'। বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে সর্দারদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকাই তারা শ্রেয় মনে করত। ধর্ম, রীতিনীতি আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা

দেখা যেত, যদিও নিজ দেশের বাড়ির মত জাতপাতের তীব্রতা এই বাংলায় তেমন মেনে চলা হত না। গ্রামীণ মূল্যবোধ যেমন তাদের বাঁচার শক্তি দিত, তেমনই গ্রামীণ সম্পর্ক তাদের কাছে বীমার মত কাজ করত। ছাঁটাই, লক-আউট বা কারখানা বন্ধ হলে, তারা গ্রামে ফিরে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজ জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু এই সময়ের রয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বেশির ভাগ শ্রমিকের জমি ছিল না বললেই চলে, যাদের জমি ছিল তার পরিমাণ ছিল খুব অল্প। ফলে গ্রামের জমির ওপর এই নির্ভরতা বেশিদিন টেকেনি। এই প্রেক্ষিতেই চটকল শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সারণী- ১

১৯১১ থেকে ১৯২১ শ্রমিক অভিবাসন ও জেলাভিত্তিক অভিবাসনের মানচিত্র

	হুগলী	হাওড়া	২৪ পরগণা	ক্যালকাটা	মোট
পাটনা	৫০১৩	৬১৬০	১২৩৩৩	১৯৯৮৯	৪৩৪৯৫
গয়া	৪৮০২	৫৬১২	১৩৯৮৬	৩৮০৮৩	৬২৪৮৩
সাহাবাদ	৩৪০৭	৭৩২৪	২০৬৭২	১৬০৬৮	৪৭৪৭১
মুঙ্গের	৩৫০৬	৩৮০২	১৫৪৫৮	১৫৮৪৭	৩৮৭১৩
সারান	১০৪৭৭	৬৫৬২	২৪৭৬৮	১০৩৩১	৫২১৩৮
মুজ্জফরপুর	৪৬৭৭	৪০১৮	১১৬৮২	১৪৬৫৬	৩৫০৩৩
দারভাঙ্গা	১৯০৮	২৫৭২	৫৪৩৬	৭৭৯৩	১৭৭০৯
	৩৩৭৯০	৩৬০৫০	১০৪৩৩৫	১২২৮৬৭	২৯৭০৪২



Source- Census of India, 1921, Vol-V, Bengal, Part-I, Report, Subsidiary Table, IV, p. 142.

বিংশ শতকের শেষ দুই দশকে ভারতীয় ঐতিহাসিক মহল এক ঐতিহাসিক বিতর্কের সাক্ষী হয়েছিল। শ্রেণী চৈতন্য ও কৌম চৈতন্য নিয়ে রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দীপেশ চক্রবর্তীর ঐতিহাসিক বিতর্ক শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকে এক নতুন দিক নির্দেশ করেছিল। একদিকে

মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা শ্রমিকদের যাবতীয় কার্যাবলীতে শ্রেণী চৈতন্যের আভাষ পেয়েছিল, অন্যদিকে গ্রামসির ইতিহাসচর্চায় অনুপ্রাণিত সাবালটান ঐতিহাসিকেরা তাদের কার্যাবলীতে কৌম চেতনার প্রাধান্য খুঁজে পেয়েছিল। শ্রমিক ইতিহাসচর্চার দুটি কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। শ্রমজীবীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হয়তো শ্রেণী চেতনা, নয় তো কৌম চেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা শুরু হয়।[১৩]

বাংলার চটকল শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও ক্ল্যাসিক ও নব্য ধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ক্ল্যাসিক শ্রমিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম সমর্থক রণজিৎ দাশগুপ্তর গবেষণা পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রেণী চেতনার নিরিখে শ্রমিক অর্থনীতি, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির ব্যাখ্যা। সদ্যোজাত বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর দিন গুজরানের সম্বলহীনতা, মজুরি, শ্রম-ঘণ্টা আর কাজের পরিবেশ- প্রভৃতি বিষয় তাঁর ইতিহাসচর্চার মূল উপজীব্য। কোন ফেলে আসা কৃষক জীবনের অবশেষ নয়, বরং এই হতশ্রী নিত্যযাপনের গোড়ার অভিজ্ঞতাই শ্রমিকদের দিনযাপন এবং কর্মসূচীর দিশা নির্দেশ করত; শ্রমিকরা 'একটি জটিল যন্ত্রের নিছক অংশ বিশেষ' তাদের ভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং অন্যান্য পার্থক্য চিহ্নের বিভাজন থাকলেও, নিজদের সর্বজনীন স্বার্থ-সংহতি ক্রমে শ্রমিকদের চিন্তায় বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা কাজের বিরতির বদলে বকর-ঈদ কিংবা মহরমে ছুটির দাবি আসলে শ্রম-ঘণ্টা কমানো এবং অবসরের সময় বাড়ানোর শ্রেণী দাবি রূপেই তাঁর কাছে বেশি প্রতিভাত হয়েছে।[১৪]

অন্যদিকে দীপেশ চক্রবর্তী চটকল শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নব্য ধারার প্রবক্তা। তিনি এই শ্রমজীবীদের সামাজিক ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চাইতে, সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় অধিকতর আগ্রহী। চটকলে জঙ্গি ধর্মঘটের ঐতিহ্য থাকলেও, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের দুর্বলতা বৃদ্ধি তথা শ্রমিক সংগঠনে বহিরাগতের প্রভাব ক্রমান্বয়ে স্থায়ী হওয়ার মত সাবেকি প্রশ্নের অভিনব পথে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন দীপেশ চক্রবর্তী। দুর্বল শ্রমিক সংগঠন, সরকার ও মালিকদের দমনপীড়ন নীতি, শ্রমিকদের মধ্যে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ ভিত্তিক বিভিন্নতা, শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার অভাব ইত্যাদি প্রথাগত কারণগুলিকে অস্বীকার না করলেও, চক্রবর্তী এগুলিকে প্রাথমিক কারণ মেনে নিতে নারাজ এবং এপ্রসঙ্গে তিনি শ্রমিক সংস্কৃতির ধারণার অবতারণা করেন। তাঁর মতে চটকল শ্রমজীবীদের তাদের গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক একদিকে যেমন তাদের আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী হতে দেয়নি, তেমনি তাদের গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক প্রভাব তাদের রাজনৈতিক তথা সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠা কোনও গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল না, ছিল বহিরাগত কোনও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই শ্রমিকদের নেতা হতেন শ্রমিকদের 'নেতা' নয় কর্তা, যাকে দীপেশ চক্রবর্তী 'জমিদারী নেতৃত্ব' বলে ব্যাখ্যা

করেছেন। ফলে সমগ্র শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হত সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে যা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার স্থলে তাকে দুর্বল করতে থাকে।[১৫] এমনকি বামপন্থী ও মার্কসবাদী নেতৃত্বও এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সুতরাং দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ যোগ্য না হলেও, তা নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যা শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকে নতুন পথে ধাবিত করবে। রনজিৎ দাশগুপ্তের মত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব অস্বীকার না করেও, শ্রমিক ইতিহাসে সাংস্কৃতিক মাত্রা যোগ করা যেতেই পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রিথিঙ্কিং ওয়ারকিং ক্লাস হিস্ট্রি বইতে খুব সুন্দর ভাবে শ্রমজীবীদের সংগঠিত ও সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কৌম চেতনার (Communitarian Consciousness) কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে কৌম চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধকরণে। এক্ষেত্রে তিনি ১৮৯৫ সালের টালা দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে ধরে খুব সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন টালা দাঙ্গার সময় কিভাবে পার্শ্ববর্তী চটকলগুলি থেকে মুসলিম শ্রমজীবীরা একত্রিত হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করছে। পাশাপাশি তিনি মুসলিম শ্রমিকদের সংগঠন 'মামেডান ওয়ারকর্স ইউনিয়ন' এর কথা তুলে ধরেছেন, যাদের প্রাথামিক লক্ষ্য হচ্ছে চটকলগুলিতে বেশি মাত্রায় মুসলিম শ্রমিক নিয়োগ ও মসজিৎ সংস্কার।

যদি ১৮৮৫ এর টালা দাঙ্গা শ্রমিকদের মধ্যে কৌম চেতনার উদাহরণ হয়ে থাকে তাহলে ঠিক এর ৬২ বছর পর ১৯৪৭ সালে টিটাগড়ে দাঙ্গার পরিস্থিতি দীপেশ চক্রবর্তীর অবস্থানের বিপরীতে একমাত্রিক কৌম চেতনার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা যায়। যেখানে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তি ও সহবাসস্থানের পক্ষে সওয়াল করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের আই. বি. রিপোর্ট থেকে জানা যায় সেই দিনের ঘটনা-

পরবর্তীকালের উত্তর ২৪ পরগণার টিটাগড়ের সুপরিচিত কংগ্রেসী শ্রমিক নেতা কৃষ্ণকুমার শুক্লার বাবা শিউ বালক শুক্লা জেলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা ছিলেন এবং কৃষ্ণকুমার শুক্লা রাজনৈতিক হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের পাশাপাশি কৃষ্ণকুমার শুক্লা আর্যসমাজ তথা হিন্দু মহাসভার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং তাঁর মধ্যে জাতিগত অসহিষ্ণুতা নাজী ফ্যাসিবাদীদের সমতুল্য। বিগত দুর্গা পূজার সময় তাঁর আব-ভাব এমন ছিল যেন সে আইনশৃঙ্খলা ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত। এমনকি বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি হেতু স্থানীয় প্রশাসকের নিষেধের সত্ত্বেও, সে লাঠিসহ দুর্গাপূজার বিজয়া মিছিল করতে চেয়েছিল। আইনশৃঙ্খলার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এতই যে, স্থানীয় প্রশাসকের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য করার জন্য স্থানীয় কিছু হিন্দুদের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রচার চলায়, যাতে কেউ বিজয়ার বিসর্জন না করে। কৃষ্ণকুমার শুক্লাকে ২৩শে অক্টোবর ১৯৪৭ রাতে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রফতারী স্থানীয় অভিবাসী হিন্দু শ্রমজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তারা কৃষ্ণকুমার শুক্লার মুক্তির দাবিতে

আন্দোলন শুরু করে। তাঁর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত টিটাগড়ের বউবাজার, বাঁশবাগান, গ্লাস ফ্যাক্টরি এবং মেহেন্দ্রবাবু লেনের পূজা সংগঠকরা দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে অস্বীকার করে। প্রশাসন তাঁকে ছাড়তে রাজি না হলে দুর্গা ঠাকুরের প্রতিমা বিসর্জন স্থগিত থাকে। এমনকি মহেন্দ্রবাবু লেনের ঠাকুর লরিতে তোলা হলেও, অন্যান্য পূজা কমিটির সিদ্ধান্তকে দেখে, তারাও মূর্তি সস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ২৪ তারিখ রাতে প্রায় ৫০০০ মানুষের টিটাগড় থানার নিকট জড়ো হয় এবং শ্লোগান দিতে থাকে 'শর্মাজী (কৃষ্ণকুমার শুক্লা পাড়ায় শর্মাজী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন) কো ছোড় দো' 'পুলিশ জুলুম বন্ধ কর' ইত্যাতি। ভিড় ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণকুমার শুক্লার মা যখন পুলিশ ষ্টেশনের বারান্দা থেকে ভিড়কে সম্বোধন করে শান্ত হতে বললে ভিড় নিয়ন্ত্রনে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রমজীবীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়।

২৫ তারিখ সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে প্রায় ৫০০ যুবকদের একটি মিছিল টিটাগড় রোডে বের হয়। তারা হিন্দু দোকানদারদের দোকানপাট বন্ধ করে ধর্মঘট করার আহ্বান জানায়। কৃষ্ণকুমার শুক্লা ওরফে শর্মাজীর গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে কিছু হিন্দু দোকানদার, যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল কৃষ্ণকুমার শুক্লার পার্টির লোক তাদের দোকানপাট বন্ধ করে প্রতিবাদ জানায় এবং পরবর্তীকালে পুলিশরা মিছিলকারীদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পরিণামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে ধমক দিলে ভিড় ক্রমশ কমতে থাকে। পরে পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং মুসলিমদের উৎসব বকরীদ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৭ টিটাগড় অঞ্চল জুড়ে কিছু গুজব ছড়িয়ে পরে, ১) কৃষ্ণকুমার শুক্লার মা নিজ সন্তানের গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে অনশন শুরু করবেন, ২) সর্দার পটেল তথা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির অন্যান্য সদস্যকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। ৩) শুক্লার সমর্থিত পার্টি এই বিষয়কে কেন্দ্র করে স্থানীয় জুটমিলে হরতাল সংগঠিত করার চেষ্টা করছে (দি কেনিন্সন জুট মিল, টিটাগড় জুট মিল ১ এবং ২)। তবে সরজমিনে তদন্ত থেকে জানা যায় যে, শুক্লার মায়ের অনশনের গুজবের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই এবং তিনি রোজকার মত নিজ স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া করে যাচ্ছিলেন। সর্দার পাটেল তথা অন্যান্য নেতাকে টেলিগ্রামের কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি জুটমিল শ্রমিকদের মধ্যে হরতালের কোনও প্রস্তুতিও নজরে পড়ে না। স্থানীয় স্তরে তদন্ত থেকে জানা যায় যে, যদিও শুক্লার গ্রেফতারীর প্রেক্ষিতে স্থানীয় হিন্দুদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এক বিরাট অংশ শুক্লা এবং তাঁর পার্টির বিজয়া উপলক্ষ্যে লাঠিসহ মিছিলের অনড় মনোভাব পছন্দ করেনি। এবং তারা আর কোন ধরনের ধর্মঘট সংগঠিত করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে উৎসাহী নয়। খড়দহে বসবাসকারী অভিবাসী শ্রমজীবী হিন্দুরাও কৃষ্ণকুমার শুক্লার পার্টির এই কর্মকাণ্ডকে হঠকারিতা তথা বোকার মত কাজ বলে নিন্দা করেছে। বেশিরভাগ হিন্দুরা অযৌক্তিক কোন দাবিদাওয়া তুলে পরিস্থিতি জটিল না করে বিষয়টির বন্ধুত্বপূর্ণ

নিষ্পত্তিতে সহমত হন। তবে শুক্লার পার্টি এক ইঞ্চ জমি ছাড়তে নারাজ, তারা তাদের সমস্ত দাবি পূরণের আশ্বাস চায় এবং প্রশাসনকে তাদের দাবির সামনে নত করতে চায়।[১৬]

বস্তুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনে বদল ঘটায়। একদা সর্দারদের নেতৃত্বে দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবীরাই দাঙ্গার তীব্র বিরোধীতা করে। আসলে শ্রমজীবীদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ঠিক করে তাদের চেতনা কোন খাতে প্রবাহিত হবে, কতক্ষণ সেই চেতনা ক্রিয়াশীল থাকবে আবার একই সাথে একাধিক চেতনা সহাবস্থান করবে কিনা। চটকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৪৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে শ্রমজীবীদের জীবনে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন কিভাবে তাদের বিভিন্ন চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

এপ্রসঙ্গে শুভ বসুর পর্যবেক্ষণ প্রণিধান যোগ্য। তিনি তাঁর গবেষণা Does Class Matter? গ্রন্থে এ এই মর্মে উপনীত হয়েছেন যে শ্রেণীর পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে তাদের একমাত্রিক গঠন তথা চরিত্রের কথা বলে বা একটি মাত্র প্রধান পরিচয়ের ওপর জোর দেয়, তা ক্রমশ ইতিহাসে তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। বরং শ্রেণী পরিচয় গঠনে একমাত্রিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে তার সাথে জাতি ও লিঙ্গগত পরিচয়ের মিথস্ক্রিয়ায় শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার ক্রমবর্ধমান প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। বহুমাত্রিকতা যুক্ত শ্রেণী পরিচয় এখন আবার বহুমাত্রিক ব্যক্তি পরিচয়ের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।[১৭] সুমিত সরকারও শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এই নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন রাজনৈতিক জীবনে শ্রেণী থেকে ব্যক্তির বৌদ্ধিক পরিচয়ের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানান্তরের প্রবণতা বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় সুস্পষ্ট ধারা, ভারতেও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সেই কারণে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে, শ্রেণী স্থলে পরিচয়ের রাজনীতি ক্রমশ পোক্ত হচ্ছে। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনুভূত হয় মূলত দৃষ্টিভঙ্গীগত অবস্থান পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।[১৮]

যদিও উনিশ শতকের শ্রমিক চেতনা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, আমার আলোচ্য বিষয় হল এই একবিংশ শতকে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে একাধারে কৌমচেতনা ও শ্রেণীচেতনার সহবাসস্থান ও অন্যদিকে তাদের কৌমচেতনা ও শ্রেণীচেতনা কীভাবে তাদের ব্যক্তি চেতনার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তনশীল। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে চটশিল্পকে কেন্দ্র করে আগত অভিবাসী শ্রমিকেরা, যারা ছিন্নমূল রূপে বাংলায় থাকত, ১৯৪৭ এর পর থেকে তারা ধীরে ধীরে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হতে শুরু করে। তাদের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, চারিত্রিক গুণ, ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলে তাদের ব্যক্তি চাহিদা, ব্যক্তি স্বার্থ তাদের কৌম চেতনা তথা শ্রেণী চেতনাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এইভাবে শ্রেণী এবং কৌম পরিচয়ের মধ্যে ব্যক্তি পরিচয়ে গুরুত্ব বৃদ্ধি শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারাটিকে একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চারও বিষয়

করে তোলে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রেণীর একমাত্রিকতা নানা ভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে দেখা যায়, অনেক সময়ই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী স্বার্থ শ্রেণী চেতনায় ভাঙ্গন ধরায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরন হিসাবে জনাথন পি পেরির ক্লাসেস অফ লেবার: ওয়ার্ক এন্ড লাইফ ইন এ সেন্ট্রাল ষ্টীল টাউন গবেষণাগ্রন্থটির কথা বলা যায়। এই গবেষণা মূলক কাজের মধ্য দিয়ে পেরি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র খুব স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক পেরি তাঁর মূল তত্ত্বে ভারতীয় সমাজের স্তর বিভাজনে জাতের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষা দরুণ ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে জাতপাতের ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে আরম্ভ করে পঙক্তিভোজনের মধ্যে এই হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার ছাপ তেমন নজরে পড়ে না। শিল্পায়নের ফলে নগরগুলিতে জাতপাতের প্রকোপ যে অনেকটাই শিথিল হয়ে যায় এটা তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এক নতুন বিভাজন সৃষ্টি হয়। স্থায়ী চাকরিজীবীদের অবসরের পর সেই পদে নতুন নিয়োগ না করে ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে ভিলাই ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। এক স্তরকে 'লেবাব অ্যারিস্টোক্র্যাট' বলা যায়, এদের চাকরি নিশ্চিত, সন্তানরা ভালো স্কুল-কলেজে পড়া লেখা করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরা সচেতন, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে অবসর জীবনটা সুখে কাটাতে চান। অপর স্তরে আছে ঠিকা শ্রমিকেরা যাদের জীবনে চাকরির নিশ্চয়তা নেই, সংসারে অভাব লেগেই থাকে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হিমসিম খেতে হয়। এই দুই পক্ষই শ্রমিক শ্রেণী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দু পক্ষরই স্বার্থ এক নয়। তাই ঠিকা শ্রমিকরা তাদের আন্দোলনে এই স্থায়ী শ্রমিকদের তাদের পাশে পান না। অন্য দিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্থায়ী চাকরিজীবীদের সাথে একাত্ম অনুভব করলেও, এই ঠিকা শ্রমিকদের তেমন পাত্তা দিতে নারাজ। ইউনিয়নের সাথে স্থায়ী চাকরিজীবীদের সম্পর্ক ভালো কারণ তাদেরই সমর্থন ও দানের টাকায় এই ইউনিয়নগুলি সচল থাকে, চাকরি স্থায়ী হওয়ায় তাদেরকে সংগঠিত করাও খুব সহজ। অন্যদিকে অস্থায়ী শ্রমিকদের চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায়, আর্থিক ও সাংগঠনিকভাবে তারা ইউনিয়নের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর এই বিভাজন সম্পর্কে মালিক শ্রেণী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাই প্রয়োজনে ও সুযোগ বুঝে তারা তাদের মধ্যকার এই বিভাজনকে ব্যবহার করেন ধর্মঘট তথা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য। উভয় স্তরের শ্রমিকদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করে শ্রেণীর মধ্যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে পরস্পর বিরোধী মানসিকতার জন্ম হচ্ছে তা তিনি তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি তাঁর গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন তা হল, ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষত ঠিকা শ্রমিকের মধ্যে আত্মীয়-পরিজনের প্রতি টান জোরালো কেন। তিনি দেখিয়েছেন স্থায়ী শ্রমিকদের সাথে আত্মীয়-

স্বজনের তেমন যোগাযোগ না থাকলেও, ঠিকা শ্রমিকরা তাদের আত্মীয় পরিজনের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রাখে। এর কারণ হিসাবে তিনি তাদের চাকরি জীবনের অস্থায়িত্বকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে এই পারিবারিক সম্পর্কগুলিকে বীমার মত করেই নিরাপত্তার আচ্ছাদন হিসাবে তারা ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রেও তাদের কৌম চেতনার চেয়ে ব্যক্তি চেতনা তথা স্বার্থই বেশি প্রাধান্য পায়। এই গবেষণায় ইস্পাত শহরে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৈচিত্র্যময় পরস্পর বিরোধী স্বার্থের প্রকাশ শ্রেণী চেতনার একমাত্রিক চরিত্রটিকে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করায়। পেরি তাঁর গবেষণায় শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, শ্রমিক পরিচয় নির্ণয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের মধ্যে যেমন একাধিক স্বার্থ ক্রিয়াশীল থাকে, ঠিক একইভাবে শ্রমিকদের মধ্যেও পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ক্রিয়াশীল থাকে, যা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এই স্বার্থবোধ না থাকলে হয় তো মার্ক্সকে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান দিতে হত না। বিশ্বায়নের যুগে এই স্বার্থবোধ নগ্নরূপ ধারণ করেছে। অধ্যাপক পেরির গবেষণা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১৯]

প্রায় কমবেশি একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় চটকল কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলে। স্থায়ী, বদলি, ক্যাজুয়েল, ভাগাওয়ালা, জিরো নাম্বার প্রভৃতি একাধিক বর্গে শ্রমিকরা বিভক্ত। ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীরূপে সংগঠিত হয়ে আপোষহীন সংগ্রাম প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয় না যা শ্রমিকদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত স্বার্থেরই ইঙ্গিত দেয়। যদিও চটকল শ্রমিকদের গ্রামীণ সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে এসেছে। তারা অহরহ চটকল বন্ধ হওয়ার দরুণ অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধানে ব্রতী হতে থাকে, ফলে তাদের রাজনৈতিক চেতনার জগতেও এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বামপন্থীদের ক্রমশ কোণঠাসা হওয়ার মধ্য দিয়ে।

শ্রেণী ও ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে অর্থনীতি ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সমাজের মূল চালিকাশক্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি শ্রেণী বা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় অন্যতম সহায়কের ভূমিকা পালন করে। বিশেষত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সমাজ ও আধুনিক দল নির্ভর সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো পরস্পরের অস্তিত্বের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে দেখা যায়। যে গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা দলের রাজনৈতিক প্রভাব যত বেশি তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি দুটোই তত বেশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই পর্যবেক্ষণের সাপেক্ষে একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন রাজনীতি ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুবাদেই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্পক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চটশিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের উত্থানের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা যেতে পারে।

বাংলায় আগমনের পর এই অভিবাসী অবাঙালি শ্রমজীবীদের এখানকার পরিস্থিতির

সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল। প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক রণজিৎ দাশগুপ্ত তার গবেষণায় ১৮৯০ সালকে চটকল শ্রমজীবীদের শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশের সময়কাল হিসাবে দেখেছেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিক বিরোধগুলি সংগঠিত ছিল না। কিন্তু ১৮৯০এর দশক থেকেই চটকল শ্রমজীবীদের মিল মালিক ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৯৩ সালে শিবপুর এবং হাওড়া জুটমিল ধর্মঘট, ১৮৯৪ সালে শ্যামনগর জুটমিল ধর্মঘট, ১৮৯৫ সালে টিটাগড় ও চাপদানি জুটমিল ধর্মঘট তথা কামারহাটি, কাকিনাড়া ও বজবজ জুটমিল অঞ্চলে দাঙ্গা, ১৮৯৬ সালে বরাহনগর, শিবপুর, বজবজ জুটমিল ধর্মঘট। বস্তুত ১৮৯৫ সালের বজবজ জুটমিলে ছয় সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট এক বৃহত্তর ধর্মঘট ছিল, যা মূলত পরিচালিত হয়েছিল সর্দারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ১৮৯৬ ও ১৯০৬ সালেও বজবজ জুটমিলই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল।[২০] ১৯০০ সালের কাকিনাড়া, কামারহাটি ও বজবজ জুটমিল ধর্মঘটকে তিনি চটকল শ্রমজীবীদের শ্রেণীচেতনার পূর্বাভাষ বলেই মনে করেন। যদিও এই ধর্মঘটগুলির চরিত্র ছিল বিচ্ছিন্ন, নেতৃত্ববিহীন ও ক্ষণস্থায়ী। উল্লেখিত ধর্মঘটগুলির কারণ ছিল মূলত অর্থনৈতিক। এর পাশাপাশি প্রতিবাদ হত, কাজের সময় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, সর্দারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তথা ধর্মীয় উৎসবে ছুটিকে কেন্দ্র করে।[২১]

বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে চটকল শ্রমজীবীরা তাদের ধর্মঘটগুলিকে সংগঠিত রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব এসে পড়ে শ্রমজীবীদের জীবনে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিম্ন মজুরির হার, প্রায়শই জাতিগত অপমান, জাতীয় আন্দোলন শ্বেতাঙ্গ-ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত চটশিল্পে ধর্মঘটের ইন্ধন যোগাত। ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর জাতীয় প্রতিবাদ দিবসে ১২টি চটকল ধর্মঘট করেছিল। এই সব ধর্মঘটে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, আগস্ট ১৯০৬এ তিনি বজবজে ভারতীয় মিল শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন।[২২]

১৯০৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত বাংলার চটকলগুলিতে বিক্ষিপ্ত শ্রমিক অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেলেও, মূলত গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯১৯ সালে শ্রমিক অসন্তোষকে রাজনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠা, শ্রমজীবীদের সংগঠিত আন্দোলনের জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে ভারত তথা বাংলায় মার্ক্সবাদের শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৯১৭ রুশ বিপ্লবের প্রভাব ভারতে এসে পৌছায়। বিক্ষিপ্ত বাম দল তৈরি হতে থাকে। তারা ক্রমশ অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং কালক্রমে এই সংগঠনে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এরা ঔপনিবেশিক শাসনের পাশাপাশি শ্রম ও পুঁজির বিরোধে বিশ্বাসী হওয়ায়, খুব সহজেই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের মধ্যে নিজেদের জায়গা তৈরি করতে সমর্থ হয়।

১৯২০ সালে এই চটকল শ্রমিক আন্দোলনের পরিধি বজবজ ছাড়িয়ে হাওড়ায় সম্প্রসারিত হয়। এই পর্যন্ত আন্দোলন কিন্তু কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের ব্যানারের তলায় হয়নি। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে চটকলও সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯২১ সালে জগদ্দলের চটকল শ্রমিকদের প্রতি ১৯২১ সালে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের একটি প্রচার পত্রে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয় যেখানে বলা হয়-

"ভাইসব! এখন গুরুতর সঙ্কটের সময়। এই সময়ে নিতান্তই সামান্য ভুল গুরুতর ক্ষতি করবে। সুতরাং সাবধান। শোনা যাচ্ছে কোন উকিল, আদালতের মাধ্যমেই মজুরি পাওয়া যাবে বলে আপনাদের উপদেশ দিয়েছে। আপনারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, কাজেই একজন উকিলের ফাঁদে আপনাদের পক্ষে পড়া স্বাভাবিক। চটকল কর্তৃপক্ষ আপনাদের সাপ্তাহিক মজুরি কমিয়ে দিয়েছে আপনারা কম বেতনে কাজ করতে রাজী না হলে কোর্ট কি করতে পারে? তারা কিছুই করতে পারে না। চটকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপনাদের কি কোন চুক্তি হয়েছে? তারা কি লিখিতভাবে আপনাদের কিছু জানিয়েছে যে আপনারা প্রতি সপ্তাহে এই রকম বেতন পাবেন? এই রকম চুক্তি হয়নি, তা হ'লে কোর্ট কি করতে পারে? আপনি একটি জিনিস পাঁচ টাকায় বিক্রয় করতে চান আর অপর একজন সেই জিনিসই চার টাকায় কিনতে চায় আপনি কি সেই পাঁচ টাকা, কোর্ট থেকে আদায় করতে পারেন? নিশ্চয়ই না। যদি ক্রেতার প্রয়োজন থাকে ও আপনি সে জিনিসই পাঁচ টাকার নিচে বিক্রয় করতে রাজী না হন, তাহলে ক্রেতাকে পাঁচ টাকা দিয়েই জিনিসটি কিনতে হবে। এখানে আদালত আসে কি ভাবে? উকিলকে আমাদের সামনে ঐ বিষয়ে কথা বলতে বলুন, আমরাই তাঁকে ঠিক উত্তর দেব। ঐ উকিল এই সব বিষয় কোর্টের সামনে বললে তাঁর ব্যবসা চলে যাবে। আপনাদের একখণ্ড বা এক খণ্ডের অর্দ্ধেক কাপড় বুনতে কে উপদেশ দিয়েছে? এর ফলে মালিকের ক্ষতি হবে ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে আপনারও মজুরি কমে যাবে। একটা ধর্মঘট শুরু হতে যাচ্ছে, এই সময় আপনাদের আরও বেশি পয়সা থাকা দরকার। ভাই সব! আমরা আবার বলছি পরিস্থিতি খুবই জটিল। শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য ঠিক করুন। এখানে সবাই তাদের উপদেশ নেয়, কিন্তু কাজ করে নিজের বিবেকের কাছে ঠিক বলে মনে হয় সেই মত। ধর্মঘটের দিকে যেতে আপনি যত দেরী করবেন, ততই আপনার স্বার্থ ব্যাহত হবে। সব চটকল বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মালিকদের টনক নড়বে না। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন, অন্যরা আপনাকে অনুসরণ করবে। এখন ধর্মঘটের জন্য তৈরী হোন। ন্যায় এবং সত্য আপনার পক্ষে, ভাইসব! আপনারা ঐক্যবদ্ধ হলে জয় আপনাদের হবেই।"[২৩] শ্রেণী চেতনা গড়ে তোলার প্রয়াস স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এই প্রচারপত্রগুলিতে।

১৯২৩ সালে ভাটপাড়া ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি হয়। যাকে কেন্দ্র করে ১৯২৫ সালে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় শিবনাথ ব্যানার্জী, কালিদাস ভট্টাচার্য,

সিদ্ধেশ্বর চ্যাটার্জী এবং সন্তোষকুমারী গুপ্তা প্রমুখের নেতৃত্বে। মূলত এই সময় থেকেই চটকলে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[২৪]

১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চটকলগুলিতে ধর্মঘটের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর দাবিদাওয়ারকে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে চাইলেও শ্রম ও পুঁজির বিরোধ তারা কখনই চায়নি। অথচ শ্রমিক অসন্তোষ মূলত ছিল অর্থনৈতিক।[২৫]

সারণী- ২

Conflict in the Jute Mill Industry, 1921-1927

Year	Number of Disputes	Number of Workers Involved	Number of Workdays Lost
1921	38	2,02,231	9,15,422
1922	41	1,64,589	11,57,100
1923	32	93,280	7,47,756
1924	20	69,983	3,87,996
1925	15	45,487	2,46,082
1926	33	1,29,951	7,69,022
1927	11	34,296	2,34,715

Source: Bulletins of Indian Industries and Labour, issue No. 30, Pp. 31-37.

এপ্রসঙ্গে ১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের দ্বারা প্রচারিত কয়েকটি লিফলেটের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। একটি প্রচারপত্রে বলা হয়- "ভাই সব! গঙ্গার দু'পারের চটকলেই ১৯২৯ সালের ১লা জুলাই থেকে সপ্তাহে আরও ৬ ঘণ্টা কাজ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষভাবে এই শহর ও অন্যান্য জায়গায় পাটের কাপড়ের বিশেষ চাহিদাও রয়েছে। এই জন্যই মিল মালিকরা আরও বেশি পাটের কাপড় চান। তারা চটকল আরও বেশি সময় চালু রেখে, শ্রমিকদের কাছ থেকে আরও বেশি কাজ আদায় করতে চায়। এই ভাবেই মিল মালিকরা অংশীদারদের জন্য আরও বেশি মুনাফা ও ম্যানেজিং এজেন্টদের জন্য আরও বেশি আয় বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে আরও কাজ চাইছে। তাঁতীকে কাজ বেশি করতে হবে। কেন এই নারী, পুরুষ ও শিশুরা বেশি কাজ করবে? শ্রমিকদের অনেক বেশি সময় কাজ করিয়ে বেশি মাইনের বাবুরা পরিশ্রম না করেই নিজেদের মাইনে বাড়াতে, বছরের গ্রাচ্যুইটি ১০০ টাকা আর ৩০ টাকা থেকে ৬০ টাকা করে লাভ বাড়াতে চাইছে।

ভাইসব! আপনারা প্রতিদিনই কঠোর পরিশ্রম করেন। সপ্তাহে আপনারা কি মজুরি পান? আপনাদের শ্রমে যে পাটের কাপড় তৈরী হয়, মিল মালিকরা তা বিক্রি করে লাভ করে। ভেবে দেখুন আপনাদের অতিরিক্ত ছ'ঘন্টা পরিশ্রম ওদের কি বিরাট মুনাফা এনে দেবে। আপনাদের শ্রমের ফলে ধনীদের পেট ভরবে আর আপনাদের হাত ব্যথা হবে? না, এটা বন্ধ করতে আপনাদের সচেষ্ট হতে হবে।

মানুষ লোহা দিয়ে তৈরী নয়। এটা দুঃখের কথা যে, আপনারা কোন বিশ্রাম পান না। আপনারা অধিক সময় কাজের জন্য কোন কমিশন বা বোনাস পান কি?

প্রতি বছরই ইংল্যাণ্ড থেকে এসে শ্রমিক নেতারা অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন আর আপনাদের নির্দিষ্ট সময় ও মজুরি বাড়াবার চেষ্টা না করতে উপদেশ দেন। ঐদেশে শ্রমিকদের আয় বেশি ও তারা আরামে থাকে। অসুস্থ হলেও তারা কিছু মজুরি পায়। আপনারা কি কিছু পান? তাদের দেশের মহিলারা প্রসবের পরে বাড়ী বসেই কাজ না করে কিছু ভাতা পেয়ে থাকেন। এদেশের শ্রমিক মহিলারা কি ঐসব পান? তারা বলেন- আট ঘণ্টার বেশি কাজের সময় হওয়া উচিত নয়। আর আপনারা এখানে কি করছেন? ঐদেশে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করালে সর্দারদের মিল মালিকরা জরিমানা করতে পারেন এমন আইন আছে।

এখানে এমনই খারাপ অবস্থা যে আপনারা আইন মত কাজ করেন, না বেশি সময় কাজ করেন তা দেখবার জন্য কোন পরিদর্শক নেই। আপনারা কি ওদের শয়তানী বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টা করেছেন?

ভাই সব! আপনারা পশু নন, মানুষ। নীচের দাবি আদায়ের জন্য তৈরী হোন ও অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলুন-

(১) আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়েও আধ ঘন্টার জন্যও বেশি কাজ করব না। কারণ আমাদের বিশ্রাম প্রয়োজন।

(২) আমাদের মধ্যে কোন নারী বা পুরুষ আট ঘণ্টার ১ মিনিটও বেশি কাজ করবে না।

(৩) এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কোন নারী বা পুরুষই সপ্তাহে আট টাকার কম মজুরি না পায়।

(৪) এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিদর্শকরা কোনদিন আট ঘণ্টার বেশি কাজ করালে তা' দৃষ্টিগোচর হয় এবং দায়ী অফিসারদের শাস্তি হয় আর ওদের এই বঞ্চনা বন্ধ করা যায়।

(৫) অসুস্থতার সময় অর্ধেক মজুরি দিতে হবে।

(৬) প্রতি বছর বেতনসহ বিশেষ ছুটি দিতে হবে।

(৭) প্রসবের আগে নারী শ্রমিকদের পুরো মজুরিতে ছুটি দিতে হবে।

আজ একদিন, আবার ছ'মাস পরে এক দিন ধর্মঘটে আপনাদের দাবি আদায় হবেনা।

ভাইসব! উপরের দাবিগুলির জন্য সকলে মিলে কাজ শুরু করুন। আপনাদের দারীপুরণ না হলে সকলে মিলে ধর্মঘটে সামিল হোন। আপনারা এক হয়ে কাজে লাগলে জয়ী হবেনই।"

স্বাক্ষর: ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্ত, এম.এ. পি.এইচ.ডি., সভাপতি বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন, বঙ্কিম মুখার্জী, কালী সেন, আবদুর রহমান, মনি সিংহ, শচীন্দ্র চ্যাটার্জী (চাপদানী শাখা), প্রমোদ ঘোষ (ভাটপাড়া শাখা), মিয়াজান (চেঙ্গাইল শাখা) সিকাদার (বজবজ পাখা), ও সত্যনারায়ণ (টিটাগড় শাখা)।[২৬]

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে শ্রেণীরূপে গড়ে তোলার প্রয়াস উক্ত প্রচারপত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রমিকরাও নেতাদের আবেদনে সাড়া দেয় এবং বাংলার চটকল ইতিহাসের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট সুসংগঠিত ভাবে গড়ে তোলে।

আর এক প্রচার পত্রে বলা হয়- "ভাই সব! আপনারা সবাই জানেন ১লা জুলাই থেকে সপ্তাহে ছ'ঘণ্টা বেশি কাজ করার জন্য মিল মালিকরা নতুন নির্দেশ জারী করেছেন। আপনাদের দিয়ে ছ'ঘণ্টা বেশি কাজ করিয়ে, আপনাদের রক্ত নিঙড়ে ওরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করবে। আর আপনারা কি পাবেন?

...শান্তভাবে বিচার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একমাস পরে আপনাদের সাপ্তাহিক মজুরি আবার কমে গেছে। এটা বুঝতে পারলে আপনাদের কিছু করতেই হবে। আপনারা কি জানেন এর কি প্রতিবিধান? বাঁচতে হলে আপনাদের লড়াই করতে হবে। বাংলার সব চটকলে যুক্তভাবে সংগ্রাম করার এটাই হল উপযুক্ত সময়।

ভাই সব! এগিয়ে আসুন, আপনারা যেই হোন, এক হোন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করুন ও প্রতি চটকলে একদিনে হরতাল পালন করুন। পেটমোটা মালিকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুক উঁচু করে দাঁড়ান। হরতাল ছাড়া বেঁচে থাকবার আর কোন পথ নেই। আপনারা এক হয়ে সংগ্রাম করলে নিশ্চয়ই সফল হবেন।[২৭]

১৯২৯ সালে জুলাই মাসে প্রথম চটকলে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়, যার নেতৃত্ব দিয়েছিল বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। ধর্মঘটটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চটকলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি, ছাঁটাই ও সমানুপাতিক হারে বেতন বৃদ্ধি না হওয়ার প্রতিবাদে। ধর্মঘট ছড়িয়ে পরার অনেক পরে ট্রেড ইউনিয়ন তাদের দাবিসনদ প্রস্তুত করেছিল। কংগ্রেস মৌখিকভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করে। সরকারী মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি দাওয়ার মেনে নেওয়া হয়। আংশিক এই সফলতার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যকার দলাদলিও এই সময় পর্বে প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইউনিয়ন কমিউনিস্ট ও প্রভাবতী দাশগুপ্তার নেতৃত্বাধীন অ-কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী কালে বিশ্ব মহামন্দার দরুণ চটকলগুলিতে ব্যাপক ছাঁটাই, বেতন হ্রাস হলেও চটকল শ্রমিকরা কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন করতে সক্ষম হয়নি।[২৮]

১৯৩৭ সালে চটকল সাধারণ ধর্মঘটের দ্বিতীয় ঢেউ ওঠে। ১৯৩৭ এর চটকল ধর্মঘট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিকতার আরও এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে মে মাস পর্যন্ত দফায় দফায় আন্দোলন বিভিন্ন চটকলে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও চটকলগুলিতে আন্দোলন শুরুর অনেক পরে ইউনিয়নগুলি সম্মিলিত হয়ে সারা বাংলা কেন্দ্রীয় চটকল ধর্মঘট সমিতি গঠনের মাধ্যমে আন্দোলনে সংহতি এনে দাবিসনদ প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্ততায় শ্রমিকদের আংশিক দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে মে মাসে ১৩ তারিখ। লক্ষ্য করার বিষয় হল আন্দোলনের নেতৃত্ব শুধু কমিউনিস্টদের হাতে সীমাবদ্ধ না থেকে কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট প্রমুখরাও দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯৩৭ সালে ২৪শে জুলাই বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা ডেকে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন করা হয়।[২৯] ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন কিন্তু খুব ইঙ্গিতপূর্ণ। সংগঠনের নতুন নাম তাদের বৃহত্তর সদস্যদের চরিত্রকেই ইঙ্গিত করে। হিন্দীভাষী শ্রমিকদের মাঝে কাজ করতে গেলে প্রথমে সংগঠনের নামকে তাদের বোধগম্য তথা আপন করানো দরকার সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব তা খুব ভালোভাবেই আনুধাবণ করেছিল। কিন্তু তাদের এই অনুধাবণ শুধুমাত্র নামের মধ্যেই সীমিত থেকে গেল, শ্রমিকদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকেও আন্দোলনের মূল ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে, সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব কোন উদ্যোগ নেয়নি। সুতরাং ১৯৩৭ সালের চটকল ধর্মঘটের প্রাক্কালে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে ছিল বহুমাত্রিক। এই ধর্মঘট মূলত তাঁদের অর্থনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল, যার চরিত্র ছিল জঙ্গি।[৩০]

কিন্তু ২২শে জুন ১৯৪১ রাশিয়ার ওপর হিটলারের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া এই বিশ্বযুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের সাথে সাথে কমিউনিস্টদের অবস্থানে বদল দেখা যায় এবং জনযুদ্ধের জিগির তুলে তারা সমস্ত রকম আন্দোলন ও ধর্মঘটকে স্থাগিত রাখে, এমনকি ধর্মঘটের তীব্র বিরোধিতাও করতে শুরু করে। এই সময় থেকে পরবর্তী এক দশক তারা চটকল শ্রমজীবীদের জীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।[৩১]

কমিউনিস্টদের এই অবস্থানে শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষিত হলেও, এইপর্বে শ্রমজীবীরা তাদের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় কমিউনিস্টদের অবস্থান পরিবর্তনের বছর অর্থাৎ ১৯৪১ সালে চটকলে সর্বনিম্ন ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় মাত্র ৭টি যেখানে ৩০,৭৮;৭৮৩টি কর্মদিবস নষ্ট হয়। কিন্তু পরের তিনটি বছরে অর্থাৎ ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে এই ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫, ২৩, ২৩টি। এই সময়পর্বে বাংলার ছোট লর্ড হারবর্ট ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে লেখা একটি চিঠির কিছু বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য- 'I am not

happy about the labour situation. There have been some strikes recently which have tended to show that labour as a whole is beginning to realise its value'।[৩২] কমিউনিস্টদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ারের প্রতি সচেতন ছিল, যা তাদের শ্রেণী চেতনার ইঙ্গিত দেয়। বস্তুত ১৯৪১-এর পর কমিউনিস্টরা ধর্মঘট বিরোধী অবস্থান নিলেও, ১৯৪৭ পর্যন্ত চটকল জুড়ে রেশনিং ব্যবস্থা, বেতন ও অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল।[৩৩] নিচের সারণী থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সারণী-৩

বছর	ধর্মঘটের সংখ্যা	কর্মদিবস নষ্ট
১৯৩৮	৩৬	১,৫০,১২,২১৩
১৯৩৯	২৫	৮১,৭৪,৪৭১
১৯৪০	১১	৪০,৬৫,৭৫৪
১৯৪১	০৭	৩০,৭৮,৭৮৩
১৯৪২	২৫	৭৫,৫৪,৪৬৪
১৯৪৩	২৩	৩৫,১৮,৮৪৬
১৯৪৪	২৩	৪৭,৯৫,৯১০
১৯৪৫	০৯	৩৫,৮৩,৬০৯
১৯৪৬	৬৭	৩,৪২,৪৯,৬৯৬
১৯৪৭	২৭*	৯৭,১২,০৭৩

*বছর শেষে চারটি লক-আউট চলছিল

সূত্র- ইজমা রিপোর্ট, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা- ২২

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শ্রমিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থীদের সংঘর্ষের নীতি পরিত্যাগ করে শ্রমক্ষেত্রে বিরোধগুলিকে মূলত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধানে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (যেটি ছিল মূলত বাম প্রভাবাধীন) বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেটি পরিচালিত হবে মূলত কংগ্রেসের নীতি মাথায় রেখে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৭এ শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি.তে ভাঙ্গন দেখা যায়। বাংলার কংগ্রেসীদের ভেতর থেকেই ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট অধ্যুষিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক সংগঠনের দাবি উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৪৭ এর মে মাসে আই.এন.টি.ইউ.সি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ০৩/০৫/১৯৪৭ সালে কংগ্রেস তাদের

শ্রমিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠাকালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভার সভাপতিত্ব করেন এবং এক নতুন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, বিদেশে বন্ধ, হরতাল, ধর্মঘটের ফলে কর্ম দিবস নষ্ট না হওয়ায় শ্রমিকরা মাইনে বেশি পায় অথচ ভারতে ধর্মঘট, বন্ধ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তিনি মালিক-শ্রমিক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে আমেদাবাদ মডেল অনুসরণের কথা জানান।[৩৪] বাংলায় এর প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হয় জুন মাসে। অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আই.এন.টি.ইউ.সি.কে কোনও একমাত্রিক সংগঠন ভাবা ভুল হবে। এদেশে কংগ্রেসের ভেতর যেমন অসংখ্য গোষ্ঠী ছিল, সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আই.এন.টি.ইউ. সি.র ভেতরেও দেখা যায়।

কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার প্রাথমিকভাবে জনকল্যাণকর নীতি প্রণয়নে ব্রতী হয়। শ্রমিক ও শ্রমনীতির ক্ষেত্রেও তাদের জনকল্যাণকর নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে দ্যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পুট অ্যাক্ট, ১৯৪৮ এর ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ও এমপ্লোয়েজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ তে দ্যা মাটেরনিটি অ্যাক্ট, ১৯৬৫ তে বোনাস অ্যাক্ট, ১৯৭২ সালে গ্রাচ্যুইটি অ্যাক্ট প্রণয়নের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তার শ্রমনীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করতে থাকে। যদিও উপরোক্ত অ্যাক্ট চটকল শ্রমজীবীদের কাছে খুব সহজে পৌঁছায়নি, এগুলোর সুবিধা পেতে তাদের আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক স্বাধীনতার পর পর কংগ্রেস দল শ্রমিকদের সমর্থন আদায়ে সফল হয়, যার প্রতিফলন তাদের অধিনস্থ শ্রমিক শাখায় শ্রমজীবীদের সদস্যপদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে ব্যাপক সরকারী সমর্থন ও মালিকদের আনুকূল্যের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠনে পরিণত হয়।

সারণী-৪

Membership of Trade Union Organization (1951-1967)

	I.N.T.U.C		A.I.T.U.C		H.M.S		U.T.U.C	
Year	Affiliated Unions	Member-ship	Affiliated Unions	Member-ship	Affiliated Unions	Member-ship	Affiliated Unions	Member-ship
1951	1,232	1,548,568	736	758,314	517	804,337	332	384,962
1956	604	930,968	481	306,963	157	211,315	223	195,242
1961	860	1,053,386	886	508,962	190	286,202	229	110,034
1967	1305	1,417,553	808	433,564	258	436,977	170	93,454

Source: The Gazette of India, Volume 3, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, p. 1098

পূর্বেই বলেছি কংগ্রেস সরকার প্রণীত শ্রম আইনগুলি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি চটকল শ্রমজীবীদের কাছে পৌঁছায়নি, বরং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চটকল শ্রমজীবীরা এই অধিকারগুলি আদায় করে। কিন্তু শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস এই সময়পর্বে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন, ত্রিপাক্ষিক আলোচনা (সরকারের মধ্যস্থতায় মিল মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি), মিলে লেবার অফিসার নিযুক্তি, ওয়ার্কস কমিটি গঠন বা শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নথিভুক্তির স্টাফ (অ্যাসোসিয়েশন লেবার ডিপার্টমেন্ট) নিযুক্ত করা হয়, যারা মিলের পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত।

সারণী-৫

Complaints investigated by the Labour officers from 1949-54

	1949	1950	1951	1952	1953	1954
Dissatisfaction with wages	93	37	19	51	15	25
Prayer for Promotion	12	9	14	28	23	19
Suspension	1	5	6	13	7	4
Supersession	2	2	2	0	6	8
Transfer	1	2	0	2	8	7
Workmen's Compensation	14	6	4	9	6	**
Dismissals	244	196	164	224	239	158
Maternity Benefit	5	0	6	5	4	1
Pensions and Gratuities	534	505	380	302	222	158
Other Complaints	306	283	297	352	373	279
Total Complaints	1212	1045	892	986	903	659

সূত্র- ইজমা রিপোর্ট, ১৯৪৯-৫৪।

উক্ত পদক্ষেপগুলি প্রাথমিকভাবে ব্যাপক সফলতা লাভ করে। ইজমার বার্ষিক রিপোর্টে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ নিয়মিত নথিবদ্ধ করে, তা নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হত। কিন্তু তারপর থেকে এই ধরনের কার্যকলাপের উল্লেখ থাকলেও, তা নথিবদ্ধকরণের চল প্রায় বিলুপ্ত হয়। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ প্রথম দিকে সমাধান করার ওপর জোর দেওয়া হলেও, পরবর্তীকালে এই ধরনের আবেদন ভিত্তিহীন বলে অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার চল বৃদ্ধি পায়। ক্রমশ শ্রমিকরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে ব্যর্থ হয় এবং কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট। উপরে প্রদত্ত সারণী থেকে দেখা যায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত

অভিযোগের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে, এর দু'টি কারণ ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমত, পূর্ববর্তী অভিযোগ সুরাহ না হওয়ায় শ্রমিকরা অভিযোগ জমা করতে ক্রমশ অনীহা প্রকাশ করতে থাকে, দ্বিতীয়ত, ১৯৫৪ সালের পর কর্তৃপক্ষের অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ না রাখার মধ্য দিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ক্রমশ এই ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সারণী- ৬

Years	Number of Strikes/Lock Out	Man hour lost
1948	57	97,04,583
1949	16	42,56,345
1950	18	32,99,548
1951	6	4,26,431
1952	22	11,14,175
1953	71	42,31,857
1954	15	25,51,496
1955	63	34,09,916
1956	39	66,02,875
1957	15	21,23,115
1958	15	15,16,893

সূত্র- ইজমা রিপোর্ট, ১৯৪৮-৫৮।

উপরে প্রদত্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এই পর্যায় শ্রমিক অসন্তোষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। ১৯৪৮, ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সাল বাদ দিলে চটকলে শ্রমিক আন্দোলন তেমন প্রভাব ফেলতে পারিনি, মূলত কংগ্রেসের অনুসৃত শ্রমিক কল্যাণকর নীতির ফলে। কিন্তু তাদের অনুসৃত নীতি ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা হারাতে শুরু করলে, শ্রমিক আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে। এই পর্বে শ্রমিক অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেসের শ্রমনীতির ব্যর্থতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বাম মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন কমিউনিস্ট দল নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ইজমার রিপোর্ট থেকেও জানা যায় যে, এই পর্বে শ্রমিক লাইন তথা বস্তি অঞ্চলে এদের কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, যার প্রতিফলন আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-৭

Years	Number of Strikes/Lock Out	Man hour lost
1959	124	32,73,382
1960	58	64,00,620
1961	87	64,27,749
1962	11	46,40,483
1963	15	21,04,280
1964	86	58,70,328
1965	30	56,00,487
1966	145	1,15,95,834
1967	139	76,50,063
1968	101	73,87,376
1969	122	1,40,17,289
1970	210	43,95,169
1971	184	11,56,659
1972	27	11,68,881
1973	142	12,60,331
1974	1107	56,20,458

সূত্র- ইজমা রিপোর্ট, ১৯৫৯-৭৪।

এই পর্বে কংগ্রেসের শ্রমনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা ক্রমশ শিল্পক্ষেত্রে অবক্ষয়ের জন্য শ্রমিক অসন্তোষ তথা আন্দোলনকে দায় করতে শুরু করে। মালিকদের কারচুপি তথা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। ফলে শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। সরকারও শিল্পক্ষেত্রে যাবতীয় সংকটের দায় শ্রমিকের ঘাড়ে ফেলে নিজের মুখ রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পরে। ১৯৭৩ সালে ২১শে ডিসেম্বর কংগ্রেস সাংসদ দলের কর্মসমিতির বৈঠকে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয়। তাদের মতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই শিল্প উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সদস্যদের মধ্যে কেরলের সদস্য শ্রী কে. পি. উন্নিকৃষ্ণন বলেন, খুবই দুঃখের বিষয় যে, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সমাজতন্ত্রের বাহক নয়। বরং এই আন্দোলন করে দাবিদাওয়ার মারফৎ চাপ দেওয়ার একটি উপায় মাত্র। এখন এর ভূমিকা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মতই শুধু চাপ দেওয়া। অসমের দীনেশচন্দ্র গোস্বামী বলেন, ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুধু দাবির

কথাই বলে। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলে না। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী পূরবী মুখ্যোপাধ্যায় বলেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে রেষারেষির ফলেই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণী।[৩৫] শ্রমরাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের এই অবস্থান পরিবর্তন শ্রমিকদের আনুগত্যে আপেক্ষিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কালক্রমে সাধারণের চোখে আই.এন.টি.ইউ.সি. মালিকদের সমর্থনপুষ্ট 'সরকারী ইউনিয়ন' এর পরিচিতি লাভ করে এবং শ্রমিকরা বাম নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে।[৩৬]

এরপর ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত চটকল আন্দোলনের মূল রাশ ছিল বামপন্থী নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির হাতে। যদিও ১৯৫৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত চটকল শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র ছিল উগ্র, আপোষহীন। চটকল শ্রমিক আন্দোলন এই সময়পর্বে বেশ সাফল্যও লাভ করে, শ্রমিকদের একাধিক দাবি মেনে নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময় পর্বে শ্রমিকদের রুজির লড়াইয়ের প্রধান শরিক লাল ঝাণ্ডাধারী বামপন্থীদের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় থাকে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব শ্রমরাজনীতিতেও পড়ে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে উগ্র আপোষহীন সংগ্রাম, যা এতদিন তাদের মূল চরিত্র ছিল তা ক্রমশ ম্লান হতে থাকে, তার পরিবর্তে বামপন্থীদের মুখে শোনা যায় কর্মসংস্কৃতির কথা, যারা এতদিন লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই শ্লোগান দিত তাদের এই আপোষমুখী অবস্থান শ্রমিকদের শ্রেণীস্বার্থে আঘাত হানে। ফলে শ্রমিকদের আনুগত্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এই সময়।

১৯৯০ এর দশকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন যখন একের পর এক আপোষমুখী অবস্থান নিচ্ছে, তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে শুরু করে। অবশ্য এই সংগঠন তৈরিতে কিছু অতি বাম বা সমাজসেবীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ১৯৯০ এর দশকে কনোরিয়া জুট মিলের সংগ্রামী আন্দোলন, বোনাসকে কেন্দ্র করে ভিক্টোরিয়া জুট মিলের ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলিতে শ্রমিকদের দ্বারা আক্রমণ ও তৎজনিত ভিখারি পাসোওয়ান অন্তর্ধান মামলা, গৌরিশঙ্কর জুট মিলে পুলিশী গুলিতে রাজেশ্বর রাও এর মৃত্যুর মত ঘটনা বাম ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব পরিস্ফুট করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কর্মসংস্কৃতির নামে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা। ২০০৮ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখে দলেরই নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধের প্রতিক্রিয়ায় শোনা যায় আক্ষেপের সুর।

লক্ষ্য করার বিষয় সেই প্রাক-স্বাধীনতার যুগ থেকে স্বাধীনতা উত্তর যুগ পর্যন্ত শ্রমিকদের লড়াই এর ধরন-ধারণে পরিবর্তন ঘটলেও, দাবিদাওয়া মোটামুটি একই ছিল। এমনকি এই দীর্ঘ সংগ্রামে রাজনৈতিক সঙ্গী হিসাবে তাদের আনুগত্য বা অবস্থানের

পরিবর্তন ঘটলেও, শ্রেণী হিসাবে তাদের অবস্থান অটুট থেকেছে। ১৯৪০ থেকে ৬০এর দশক পর্যন্ত শ্রমিকরা তাদের চাহিদা মেটানোর তাগিদে কংগ্রেসকেই আঁকড়ে ধরে ছিল। কিন্তু যখন কংগ্রেস খোলাখুলি মালিক স্বার্থের পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করলে, শ্রমিকরা ক্রমশ বাম ঘেঁষা হয়ে পড়ে কারণ তখন তারাই শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দাওয়ারের স্বপক্ষে সংগ্রামে রত ছিল। আবার বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নে ক্রমশ নমনীয় হতে শুরু করলে, তাদের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তখন কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ শ্রমিক শ্রেণীর দাবিদাওয়া পূরণের প্রতি আওয়াজ না তুললে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শ্রমিকদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়, যদিও এই সংগঠনগুলির সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং অচিরেই এগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে। ২০১১ সালে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটে। রাজ্যরাজনীতি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শ্রমিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। প্রাথমিক ভাবে বামফ্রন্টের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ শ্রমজীবীরাও এই নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু এই নতুন সরকারের শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ফলে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সরকারও ব্যর্থ হয়। মজার বিষয় উক্ত সময় পর্বে ভোটরাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থীদের রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকলেও, মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রধান শরিকের ভূমিকা পালন করে।

গোষ্ঠী তথা ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আন্না সেইলারের টিটাগড়ের মাদ্রাজী শ্রমিকদের নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা।[৩৭]

বস্তুতপক্ষে বাংলার চটকল শ্রমিক ইতিহাসবিদরা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করলেও তা মূলত উত্তরভারতীয় হিন্দী/উর্দুভাষী শ্রমিক কেন্দ্রিক। কিন্তু এর পাশাপাশি সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও ওড়িয়াভাষী এবং মাদ্রাজী (তেলেগু/তামিলভাষী) শ্রমিকরা কোন কোন জায়গায় যে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করেছিল, তাদের ইতিহাস প্রায় অনুপস্থিত। ইতিহাসের পাদটীকার মত মাদ্রাজী শ্রমিকদের কথা কেবলমাত্র টিটাগড়ের ১৯৩৮-৩৯ সালের ধর্মঘটের সময় পাওয়া যায়।[৩৮]

এমনকি Arjan De Haan যিনি টিটাগড় নিয়েই বিস্তারিত গবেষণা করেছেন তিনিও মাদ্রাজী শ্রমিক নিয়ে অনেকটাই উদাসীন। কিন্তু শুধু এককালীন একটি ধর্মঘট নয়, সামগ্রিকভাবে এদের ইতিহাস আলোচনা করলে শ্রমিক চেতনা সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

টিটাগড়ের জুটমিলগুলোর মোট শ্রমিক সংখ্যার নিরিখে এদের সংখ্যা নগণ্য হলেও, এরা এমন সব বিভাগে, এমন সব পদে (strategic position) নিযুক্ত ছিল যার দ্বারা কারখানার উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করা যেত। ১৯২০র দশকের শেষ ও ৩০ এর দশকের গোড়া থেকেই এই মিলগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

ওঠে। এখানকার শ্রমিক সংঘাতের আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি ধারা স্পষ্ট। প্রথমত, ম্যানেজারদের জটিল নিয়োগ পদ্ধতিতে মাদ্রাজী শ্রমিকদের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্পিনার মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের (যারা একই সম্প্রদায়ের শুধু নয়, একই পরিবারভুক্ত ছিল) অবস্থানগত বিপ্রতীপ পরিবর্তন (adverse changes) এবং দ্বিতীয়ত, মিল এবং সংলগ্ন অঞ্চলকে ঘিরে মাদ্রাজী শ্রমিকদের ব্যবহারিক জীবন। যেখানে পারিবারিক সম্পর্কের ছাপ পড়েছে কর্মস্থলে আবার গোষ্ঠীর একতাকে সম্বল করে টিটাগড় শিল্পাঞ্চলের মাদ্রাজী শ্রমিকরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৩০ এর দশকের মধ্যভাগ কখনও ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি কখনও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে এই দুই ধারা মিলেমিশে গেছে। ১৯২০র দশকের মধ্যভাগ থেকে এই ঝোঁক লক্ষ্য করা গেলেও, ১৯৩৭ সালের পরে তা চূড়ান্ত আকার নেয়। শেষপর্যন্ত টিটাগড়ের জুটমিল থেকে মাদ্রাজী শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে এই দুই ধারার সম্মিলিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)।

সাধারণভাবে সব চটকলেই শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করত ট্রেড ইউনিয়নগুলি যার উচ্চতম স্তরে থাকতেন শিক্ষিত বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা এবং মিল স্তরে প্রভাবশালী শ্রমিক বা সর্দাররা যাদের অধিকাংশই হতেন অবাঙালি। মাদ্রাজী শ্রমিকদের এতে আপত্তি ছিল। যার ফলে ১৯৩০ এর দশকের গোড়া থেকেই নিজেরাই জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে যার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই একই কারণে। মিলের বিভিন্ন বিভাগের মাদ্রাজী শ্রমিকরা কাজ করায় তাদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সমান্তরাল একটা ক্ষমতার বোধ তৈরি হয়। মাদ্রাজী পুরুষ শ্রমিকদের পরিবারের অন্য সদস্যরা (মহিলা ও শিশুরা) একই মিলে কাজ করায় সেই ক্ষমতা আরও দৃঢ় হয়। এমনকি স্পিনিং বিভাগে কর্মরত অধিকাংশ পুরুষ মাদ্রাজী শ্রমিক প্রিপেয়ারিং বিভাগে কর্মরত তাদের পরিবারেরই মহিলা সদস্যদের আন্দোলনে যোগদানে বাধ্য করত, যেটিকে ঐতিহাসিকরা পরিবারের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব এমনকি অত্যাচারও বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক বিভাজনের পাশাপাশি লিঙ্গভিত্তিক চেতনারও এখানে স্পষ্ট।

১৯২০ দশকে যখন জগদ্দল জুড়ে চটকল ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় তখন বঙ্কিম মুখার্জীর নেতৃত্বে বি.সি.এম.ইউ.র একটি দল টিটাগড়ের শ্রমিকদের অংশগ্রহণের কথা বললে, তাঁরা প্রাথমিক ভাবে আন্দোলনে যোগদানে অস্বীকৃত হন, মূলত আন্দোলনের ফলে সীমাহীন কষ্ট ও অভাবের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বেতন বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শ্রমিক রিজার্ভে রাখা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য টিটাগড়ের মাদ্রাসী শ্রমিকেরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এই আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা তথা ছক ছিল বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। প্রথমত টিটাগড়ের তিনটে ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মিলে কর্মরত মাদ্রাসী শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয়, যা তাদের

কৌম চেতনার জ্বলন্ত উদাহরণ। এর পাশাপাশি তাঁরা তাদের পারিবারিক সম্পর্ককেও আন্দোলনের সফলতার জন্য ব্যবহার করত। বিশেষত স্পিনিং ডিপার্টের মাদ্রাসী পুরুষ শ্রমিকরা প্রিপেয়রিং বা প্রস্তুতি বিভাগের সামনে দিয়ে মিছিল নিয়ে যেত এবং ঐ বিভাগে কর্মরত তাদেরই পরিবারের মহিলাদের কাজ স্থগিত রাখার জন্য বাধ্য করত। ইতিহাসচর্চায় এটি নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষ শ্রমিকদের অত্যাচার রূপেই দেখা হয়েছে, এমনকি আন্না সেইলার তাঁর গবেষণায় বিষয়টিকে একটি পারিবারিক বন্ধন বা জোর হিসাবেই দেখেছেন। কিন্তু বিষয়টিতে কৌম চেতনা যতটা ক্রিয়াশীল ছিল, ততটাই ছিল ব্যক্তি মানুষের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নে বাড়ির মহিলারা পুরুষের পাশে দাঁড়াবে না এটা কখনই কাম্য ছিল না। অন্যদিকে বাড়ির মহিলাদেরই কলের কাজের পাশাপাশি বাড়ির অন্ন সংস্থানের কথা ভাবতে হত, তাই তাদের কাছে ধর্মঘটে পুরুষ সাথীর সাথে যুক্ত হওয়ার থেকে পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য, যা পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের পৃথক অবস্থান তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করে।[৩৯]

সেইলারের পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য জুট মিল শ্রমিকদের ইতিহাসে এই ভাবেই শ্রেণী বিভাজন, গোষ্ঠী বিভাজন এবং সামাজিক আত্মপরিচয়ের বিষয়গুলি একাকার হয়ে গেছে। তাই শুধুমাত্র শ্রমিকদের গোষ্ঠীগত যৌথ জীবনযাপনের দৃষ্টিকোন থেকে তাদের আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা হয় না। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার টানাপোড়েন, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন ও প্রতিবাদের ভাষাকেও কিছু তাত্ত্বিক ও গাঠবাঁধা ধারণা দিয়ে বোঝা যাবে না।

আবার লীলা ফার্নান্ডেজ তাঁর গবেষণায় মহিলাদের বিষয় তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন মিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন (মূলত পুরুষ প্রধান) নাইট শিফটে মহিলারা কাজ না করলে এবং যে পুরুষরা নাইট শিফটে কাজ করবে তারাই অন্যান্য শিফটেও কাজ করবে এই প্রশ্নে সর্বদা পুরুষ শ্রমিকদের পাশেই দাঁড়াত। যার ফলে মহিলারা কাজ হারায় কারণ কারখানার নিয়ম অনুসারে তারা নাইট শিফটে কাজ করত না। মূলত অবচেতন ভাবেই ঐক্য গড়ে উঠত পুরুষ প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন, পুরুষ শ্রমিক তথা মিল কর্তৃপক্ষের মাঝে, যদিও প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ ছিল। কিন্তু অবশেষ তাদের এই ভিন্ন স্বার্থ মিলিত হয়ে যায় তৃতীয় একটি স্বার্থের বিরুদ্ধে, যেটি হল মহিলাদের স্বার্থ।[৪০]

ইজমার বার্ষিক রিপোর্ট অধ্যয়ন করলে প্রায় প্রতি বছর বিশেষত ১৯৫৯ এর পর চটকল মিল বিশেষে একাধিক সংগ্রামী আন্দোলনের তথ্য পাওয়া যায়, যা মূলত কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে উক্ত মিলে সংগঠিত হয়ে থাকে কিন্তু তা সর্বভারতীয় বা সমগ্র বাংলা জুড়ে দাগ কাটতে পারেনি। একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, '১৯৯০ এর দশক থেকেই সংঘটিত সারা বাংলায় চটকল ধর্মঘটে প্রায় সমগ্র জুটমিল অংশগ্রহণ করলেও, মেঘনা জুটমিল তাতে অংশগ্রহণ করে না। শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায়- মিলের অন্যতম শরিক অর্জুন সিং মিল শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলে রেখেছেন ধর্মঘটে যোগ দিতে হবে না,

তোমরা কাজ কর, ধর্মঘটের শেষে যদি মিল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ঘটে তাহলে আমিও তোমাদের বেতন বাড়িয়ে দেব'।[৪১] অর্জুন সিং এর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে, তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, কাজ বন্ধ করে কী লাভ তাই তাদেরকে বলেছি কাজ কর, আন্দোলনের শেষে যে চুক্তি হবে তা এই মিলেও মেনে চলা হবে।'[৪২] স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় মিল কর্তৃপক্ষ তথা একশ্রেণী লিডার শ্রমিকদের ব্যক্তিস্বার্থকে সংরক্ষিত করে তাদের শ্রেণীচরিত্র গঠনের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে কাজে লাগায়। শ্রমিকরাও নিজ ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি সজাগ তাই অনেক আন্দোলন পূর্ণতা পায় না।

চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান অনুধাবণের পূর্বে নেমিয়ারের গবেষণা সম্পর্কে কিছু কথা বলা জরুরি, স্যার লুইস নেমিয়ার পলিস-জিউ বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক। নেমিয়ারের সবচেয়ে পরিচিত কাজ হল The Structure of Politics at Accession of George III, England in the Age of the American Revolution এবং তিনি জন ব্রুকের সাথে তার জীবনের পরবর্তী সময়ে সম্পাদনা করেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাস সিরিজ। যদিও নেমিয়ার গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টে, বিশেষ করে ১৭৬০-এর দশকে ব্রিটিশ রাজনীতিতে তার কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সেই দশকে তাঁর প্রধান উপসংহার ছিল যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদী নিষ্পত্তির কোন ঝুঁকি ছিল না। তিনি ব্যক্তি বিশেষের খুব বিশদ অধ্যয়নের মাধ্যমে, পার্টি সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে তাঁর বর্ণনাগুলির যথেষ্ট পরিমার্জন ঘটান।

যদিও নেমিয়ারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পার্লামেন্টে বসে থাকা সাংসদ কিভাবে তাদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সময় বিশেষে বা ইস্যু ভিত্তিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নিজ অবস্থান পরিবর্তন ঘটায়। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বিস্টলের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ব্রিস্টলের রাজনীতি পরিচালিত হত হুইগ নিয়ন্ত্রিত 'ইউনিয়ন ক্লাব' এবং টোরি নিয়ন্ত্রিত 'স্টেডফাস্ট সোসাইটি'র দ্বারা। ১৭৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে হুইগ টোরিদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, 'সহনাগরিকদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা তথা উপযুক্ত পরিষেবা দানের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি আসনে একটি করে প্রার্থী দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রশমিত করার। টোরিরা এই প্রস্তাব নাকচ করলেও, হুইগরা শুধুমাত্র একজনকে (রবার্ট নুজেন্টকে) মনোনীত করে নির্বাচন পরিচালনা করে প্রমাণ করতে চাইল যে, তারা শুধুমাত্র বিজয়ের জন্য নয় বরং শান্তির জন্যই এই প্রস্তাব রেখেছিল। ডিন টাক্কারের মতে, হুইগরা নির্বাচনে জয়পরাজয়ের চেয়ে টোরিদের সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করে যে বিরূপ আচরণের প্রদর্শন করেছে তা সর্বসম্মুখে তুলে ধরতেই শুধুমাত্র নুজেন্টের মনোনয়ন করেছিল। তিনি এই আসনে জয়ীও হন।

মিঃ নুজেন্টের পূর্বে টোরি দল সমর্থিত লর্ড ভিসকাউন্ট ক্লেয়ার ব্রিস্টল শহরের

প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন, তাঁর প্রতি সহনাগরিকদের একটি সাধারণ অভিযোগ ছিল যে, তাদের সমস্যার সময় ক্লেয়ার তাদের পাশে দাঁড়াত না। ব্রিস্টল বন্দর শহর হওয়ায় নাগরিকদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন- ট্রেজারি, বাণিজ্য বোর্ড, কাস্টমস এবং আবগারি দপ্তরের সহায়তার প্রয়োজন হত। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন থেকে তারা কোন ধরনের সাহায্য পেত না। তাছাড়া ক্লেয়ারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগও ছিল।

প্রায়শই স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির প্রভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা দলের বিপরীতে গিয়েও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ নিতেন। যেমন ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নুজেন্টের কার্যকলাপের উল্লেখ করা যায়। বিস্টলের বাণিজ্যিক বন্দরগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নুজেন্টের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যখন লন্ডনের বাণিজ্যিক বন্দরগুলির একচেটিয়া বাণিজ্যিকিকরণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিস্টলের নিজস্ব প্রতিনিধিরা নিশ্চুপ ছিলেন, তখন নুজেন্ট একমাত্র সদস্য হিসাবে লন্ডনের ব্যাঙ্কারদের আনা সংসদীয় বিলটির সোচ্চার বিরোধিতা করেন। এইমর্মে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, এ জাতীয় প্রস্তাব আইন হিসাবে পাশ হলে বিস্টল ও অন্যান্য শহরে ব্যাঙ্কিং শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। এইভাবে ইতিমধ্যে নুজেন্ট বিস্টলের বন্দর ও শিল্পগোষ্ঠীর রক্ষক ও অবিভাবকে পরিণত হয়। নুজেন্টের এই জনপ্রিয়তাকে হুইগরা কাজে লাগাতে চেয়েছিল।

হুইগরা প্রথমে নুজেন্টকে ব্রিস্টলের হয়ে দাঁড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়ে নির্বাচনী খরচ মেটানোর জন্য তার সাথে একটি খুব বড় অঙ্কের অর্থ নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি কোনো মূল্য দিতে অস্বীকার করেন, তখন ব্রিস্টলের ব্যবসায়ী, ধর্মীয় সংস্থা তথা ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীরা সম্মিলিত ভাবে নির্বাচনী চাঁদা তুলে নুজেন্টের পাশে দাঁড়ায়। ১৭৫৪ সালে নুজেন্টকে জিতিয়ে আনতে সফল হয় হুইগ, টোরি সদস্যরাও তাকে স্বাগত জানায়। ইতিমধ্যে সহনাগরিকদের মধ্যেও শত্রুতা প্রশমিত ও একটি পুনর্মিলন আবহ তৈরি হলে, টোরিরাও দেখাতে চাইল যে, তারা শহরের শান্তি বিঘ্নিতকারী নয়, তাই আগেই তারা ঘোষণা করে যে, এবার থেকে তারাই প্রথম ভবিষ্যতের জন্য সমঝোতার প্রস্তাব রাখবেন। এভাবে একটি সমঝোতায় স্থির হয় যে, পর পর তিনটি নির্বাচনে একদলের দ্বারা প্রস্তাবিত নাম অন্য দল সমর্থন জানাবে। অন্য ভাষায় বলা যায় দুটি পরস্পর বিরোধী দল একই আসনের জন্য একটি যৌথ মনোনয়নের প্রস্তাব নিয়েছিল। এভাবে নুজেন্ট ১৭৬২ পরও হুইগ হয়ে নির্বাচিত হন। ১৭৬৬ ও ১৭৬৮তেও তিনি দু'বার পুনঃনির্বাচিত হন। রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় বিস্টলে ১৭৮৩তে একটি জোট সরকার তৈরি হয়। এই জোট সরকার গঠনে একদা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন ব্রিস্টলের টোরি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্রিকডেল এবং ডায়াবেন, আবার টোরি দলের অন্যতম সদস্য ক্রুগার ১৭৮৪ সালে হুইগ দলের নেতা পিটকে সমর্থন জানাতে গিয়ে এই জোট সরকার ভেঙ্গে ফেলতে দ্বিধা করেননি। আবার ব্রিস্টলের এডওয়ার্ড ব্রিস, যিনি হুইগ দলের

১৭৮২-৮৩ সালে অ্যান্ডারম্যাণ ছিলেন, তিনি শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ হওয়ার সত্ত্বে, ১৭৮১ সালে ক্রুগারকে ও ১৭৮৪ সালে ব্রিকডেলের পক্ষে ভোট দেন।[৪৩] এইভাবে নেমিয়ার ১৮ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বসে থাকা প্রতিটি সংসদ সদস্য (এমপি) এবং সহকর্মীদের সম্মিলিত জীবনী ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, দলীয় স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ নয় বরং প্রায়শই সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ তাদের ভোট দানকে প্রভাবিত করত। নেমিয়ার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পার্লামেন্টে রাজনৈতিক দলগুলি কখনই সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ ছিল না, বরং টোরি এবং হুইগ উভয় দলের সদস্যরাই বিভিন্ন ইস্যু বা সমস্যার ভিত্তিতে ছোট ছোট সদাপরিবর্তনশীল গোষ্ঠী হিসাবে তাদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত, অনেক সময় সেই মত তাদের রাজনৈতিক দলের পরিপন্থীও হত। নেমিয়ার তাঁর লেখাতে স্বাধীন ব্যক্তি ও তাঁর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি স্বার্থ বা ব্যক্তি স্বার্থের অনুকূল গোষ্ঠী স্বার্থ ব্রিটিশ রাজনীতিতে কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। ১৯২৯ সালে নেমিয়ারের গবেষণা The Structure of Politics at the Accession of George III অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরীয়ান রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দলিল যা পরবর্তী কালে ব্যক্তি পরিচয়ের রাজনীতি নির্ধারণে পথপ্রদর্শক। নেমিয়ার ব্রিটিশ সাংসদদের স্বার্থ প্রকাশ করতে উইল এবং ট্যাক্স রেকর্ডের মতো উত্স ব্যবহার করেছিলেন। তার সময়ে, তার পদ্ধতি ছিল নতুন এবং বেশ বিতর্কিত।

নেমিয়ার তাঁর The Structure of Politics গ্রন্থে ইংল্যান্ডের নির্বাচন পদ্ধতিতে ব্যক্তি পরিচয়ের রাজনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রেণী বা কমিউনিটির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব যেমন তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে, তেমনি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষেরও যে পৃথক চাহিদা বা স্বার্থ থাকতে পারে যা ঐ ব্যক্তিকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করে, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক; সম্ভবত এই ধ্রুব সত্য নেমিয়ারই প্রথম তত্ত্বগত ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

তাঁর গবেষণা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মহলে সমালোচিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গবেষণার বিষয়কে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হলেও, ব্যক্তিস্বার্থই তাঁর গবেষণার মূল চালিকা শক্তি। পার্লামেন্টের মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে এক বৃহত্তর সমাজেও এই গবেষণা পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যেতেই পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি নিজস্ব স্বার্থ থাকে যা তাদের ভোট দানের বা রাজনৈতিক পক্ষ স্থির করতে সাহায্য করে, সে সাংসদ হোক বা জনগণ। শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান বা মিউনিসিপ্যাল তথা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদান অনেকটা নির্ভর করে তাদের প্রাত্যাহিক জীবনের অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা তথা ব্যক্তি স্বার্থের ওপর। এছাড়াও এতাবৎকাল পর্যন্ত শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আরও স্পষ্ট করে বললে শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনে অবস্থান

পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত ঐতিহাসিক দলিলগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, তারও কারণ নেমিয়ারের ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতির মধ্যে অনুধাবণ করা যেতে পারে। স্বভাবতই নেমিয়ারের গবেষণার প্রেক্ষিতকেও আমরা শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবনকে যথাযথ অনুধাবনের জন্য ব্যবহার করতে পারি।

বস্তুত ব্রিটিশ অনুকরণে গড়ে ওঠা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের ঐ নির্বাচনী চালচলনের অনেক উদাহরণই লক্ষ্য করা যায়। চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক চেতনার জগতেও এই প্রভাব প্রসার লাভ করেছিল। চটকল শ্রমজীবীদের মধ্য থেকে সর্দাররাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতা হিসাবে উঠে আসে। তাদের চরিত্রের ক্ষেত্রেও দলবদলের একাধিক উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এক দলে থেকে অন্য দলের প্রার্থীকে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমর্থনেরও অসংখ্য উদাহরণ আছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতে সকল মানুষের নাগরিক অধিকার সর্বজনীন ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি লাভ করে। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মানুষের রাজনৈতিক সত্তা তাদের ব্যক্তি স্বার্থের অনুসারী। অনেক সময় মানুষ তার কৌম, শ্রেণী, লিঙ্গ বা ভাষাগত পরিচয়কে ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন নাগরিক অধিকার পূরণ করে। সমাজ বিজ্ঞানে শ্রমিক বিষয়ক চর্চা সাধারণত যেকোন একটি পরিচয়কে কেন্দ্র করে তাদের একমাত্রিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুকোমল সেন তাঁর গ্রন্থে শ্রমিকদের শ্রেণী চরিত্রের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অপরদিকে দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর রচনায় চটকল শ্রমিকদের কৌম চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাদের জীবনধারা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর ফলে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি শ্রমিকের বা তার চরিত্র অনুধাবন সম্ভব হয় না। শ্রেণীর দ্বারা বা কৌমের দ্বারা সাধারণীকরণের যে প্রবণতা শ্রমিক ইতিহাসচর্চায় আছে, সেখানে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্তি থেকে যায়। ব্যক্তি হিসাবে শ্রমিকের পরিচয় এবং নাগরিক হিসাবে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব দুটি পূর্ব উল্লিখিত অন্যান্য উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং একটি বহুমাত্রিকতার ফসল। তাই পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি পরিচয়ের মাধ্যমে শ্রমিকের বহুমাত্রিকতা আলোচনা ও বিশ্লেষণ জরুরী।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে এই সময় পর্বে শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি যুগিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে এর ফলে ভারতের পুঁজিপতিদের সাথে শ্রমিকদের স্বার্থের সংঘাত ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্রমে তারা শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি উপলব্ধি করে এবং তাদের জাতীয় আন্দোলনের শরিক করে। কিন্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা কতটা জাতীয়তাবাদী ছিল এবং কতটা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা তাদের এই আন্দোলনে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করত, তা অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না শ্রমিকদের মধ্যে হয়তো নেতৃত্বদানকারীরা জাতীয়তাবাদ বা শ্রেণী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়, কিন্তু আপামর শ্রমিক একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আন্দোলনে যুক্ত হয় এ কথা অতি সরলীকরণ বলেই মনে হয়।

শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ (যা মূলত স্বার্থকেন্দ্রিক) ইত্যাদি তাদেরকে বৃহত্তর আন্দোলনের অংশীদার করে তোলে। সুতরাং নেমিয়ারতত্ত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় প্রয়োগ করা হলেও, শ্রমিক ইতিহাসে পৃথকভাবে এই তত্ত্ব তেমন ব্যবহৃত হয়নি বললেই চলে। যদিও অধুনা বিভিন্ন গবেষণায় নেমিয়ার তত্ত্বের কিছু ঝলক লক্ষ্য করা গেলেও, তার ব্যাপক প্রয়োগ তেমন নজরে পড়ে না। এক্ষেত্রে আমরা চটকল শ্রমিকদের রাজনৈতিক জীবনে টানাপোড়ন অনুধাবন করতে পারি তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে।

চটকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মূল রাশ ছিল বামপন্থীদের হাতে। ১৯৬০ এর দশক থেকে ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত চটকল শ্রমিকদের লাল ঝাণ্ডার তলে সমবেত হয়ে তাদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শুধু তাই নয় মিল অভ্যন্তরেও এই প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ট্রাস্টি বোর্ড হোক কিংবা ওয়ার্কস কমিটি সর্বত্র সি.পি.আই.এম. নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব ছিল লক্ষ্য করার মত। ১৯৮০ সালে ইজমা নিয়ন্ত্রিত চারটি মিলে ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন সিটু নিয়ন্ত্রিত বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন জয়ী হয়। ৬টি মিলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কস কমিটির নির্বাচনে ৫টি মিলে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করে কমিটি তৈরি করে। একটি মাত্র মিলে আই.এন.টি.ইউ.সি. সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।৪৪ ওয়ার্কস কমিটি তথা ট্রাস্টি বোর্ডে নির্বাচনে এই চিত্র বর্তমান সময় পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় রয়েছে। শুধু তাই নয় বাম রাজনীতির রক্তক্ষরণের যুগেও চটকলে বৃহত্তম সদস্যযুক্ত ট্রেড ইউনিয়নরূপে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে যা নীচের উল্লেখিত সারণী থেকে সুস্পষ্ট।

সারণী-৮

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা, ২০১৬-২০২২

জেলা	চটকলের সংখ্যা	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
উত্তর ২৪ পরগণা	২০	১৩৬৩৮	১২৮৯৫	১২০৭৪	১১১১৯	৯৫০২	৯৩৩৮	১০১৯২
হাওড়া	১৩	১১০৮২	১০৬১৩	১০৭৮৯	৯৯৩০	১০৭৪৯	১০৮২৩	১০৯১৬
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৫	৪৬৫৫	৩৭৪৫	৩৩২০	২৬৮৩	১৯২২	৩৪২১	২৫৫০
হুগলী	১২	৬৮৪৩	৬৪৭৫	৫৭৪৫	৫৯৭৭	৬২২৭	৬৬৩১	৭৫৭০
কলকাতা	২	২২৫	২৩০	২০২	২০২	২২৭	২০০	৩১২
মোট	৫২	৩৬৪৪৩	৩৩৯৫৮	৩২১৩০	২৯৯১১	২৮৬২৭	৩০০৫৪	৩১৫৪০

সূত্র- বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, ৬৭তম সম্মেলন, ১৩-১৪ মে, ২০২৩, ভাটপাড়া, মুন্সী প্রেমচাঁদ শতবার্ষিকী ভবন, পৃষ্ঠা-২০

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিকদের অবস্থানের ঠিক বিপরীত অবস্থান লক্ষ্য করা যায় রাজ্য তথা স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। ১৯৬০ ও ৭০ দশকের বাংলা জুড়ে একের পর এক ধর্মঘট, আন্দোলন ক্রমশ রাজ্য রাজনীতিতে বামপন্থীদের উত্থানের পথ সুগম করে দেয় যা ১৯৭৭ সালে রাজ্য রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের গৌরচন্দ্রিকা রচনা করে। স্বভাবতই এই পর্বে বামপন্থীরা এত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল যে, ১৯৬২, ১৯৬৭ বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সি.পি.আই.এমের নির্বাচনী মূল্যায়নে হিন্দীভাষী অঞ্চল থেকে ভোট না পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিলেও, সমস্যা সমাধানের কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। এমনকি দু'দশক পরেও এই চিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এপ্রসঙ্গে ১৯৯০এ তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধান দল সি.পি.আই.এম এর মুখপত্র 'মার্কসবাদী পথ' পত্রিকায় চিত্তব্রত মজুমদারের লেখা 'পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী ফলাফলের গতি প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা' প্রবন্ধে চটকল অধ্যুষিত ভোট কেন্দ্রগুলির নির্বাচনী বিশ্লেষণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে- 'আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জনজীবনে দারিদ্র্য ও জীবনযাপনের সমস্যার সমাধানই জনগণের কাম্য। এ কারণেই যে রাজনৈতিক দল তাঁদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে সক্ষম, জনগণ তাদেরই সমর্থন করেন।' এপ্রসঙ্গে তিনি একাধিক উদাহরণ তুলে ধরেছেন- 'গার্ডেনরীচ অঞ্চলের ১৩৭নং ওয়ার্ডের ৮টি ভোটকেন্দ্রে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস (আই) যথাক্রমে ২৩২০ এবং ১৬৬৮টি ভোট পেয়েছে। এই ভোটকেন্দ্রগুলি প্রধানত হিন্দীভাষী শ্রমিক অধ্যুষিত এবং এলাকার ৮০ শতাংশ কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিক পরিবার। এক্ষেত্রে হিন্দীভাষী ভোটের ৫৫.৮ শতাংশই বামফ্রন্ট পেয়েছে এবং কংগ্রেস (আই) পেয়েছে মাত্র ৪০.৫ শতাংশ। নির্বাচনের পূর্বেই কেশোরাম চালু হবার ফলেই সম্ভবত এই অঞ্চলের হিন্দীভাষী শ্রমিকদের ভোট বামফ্রন্ট এত বেশি হারে পেয়েছে।

পাশাপাশি গার্ডেনরীচ এলাকারই ১৩৩নং ওয়ার্ডের হিন্দীভাষী শ্রমিক প্রধান ৩টি ভোট কেন্দ্রে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৫১৮টি এবং কংগ্রেস (আই) পেয়েছে ১০১২টি ভোট। এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩৩ শতাংশ এবং কংগ্রেস (আই) পেয়েছে ৬৪.৪ শতাংশ ভোট। অঞ্চলটি বন্দর শ্রমিক অধ্যুষিত। সম্ভবত এই অঞ্চলের অধিকাংশ শ্রমিক বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলে মনে করতে পারেনি।

বজবজ চটকল এলাকার নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিক অধ্যুষিত ৬টি ভোটকেন্দ্রে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস (আই) পেয়েছে যথাক্রমে ৬১৬ এবং ১৯১৩টি ভোট। এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট ২২.৩ শতাংশ এবং কংগ্রেস (আই) ৬৯.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এক্ষেত্রে নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল এর শ্রমিকদের জীবিকার প্রশ্নে এখনও অনিশ্চয়তা সম্পূর্ণভাবে দূর না হওয়াই সম্ভবত বামফ্রন্টের এত কম ভোট পাবাব প্রধান কারণ। এই কেন্দ্রগুলিও প্রধানত হিন্দীভাষী শ্রমিক অধ্যুষিত।'[৪৫]

১৯৯০ এর দশক থেকে রাজ্য রাজনীতিতে বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতিতে ক্রমশ পরিবর্তন স্পষ্ট হতে থাকে, যার ফলস্বরূপ বামফ্রন্টের ভিত ক্রমশ নড়বড়ে হতে থাকে এবং ২০১১ সালে দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু তবু বলতে হয়, মিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের লাল ঝাণ্ডার প্রতি আস্থা এখনও অটুট আছে। ২০১১ পরবর্তী চটকলে বৃহৎ কোনও ধর্মঘট বা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি একথা ঠিক, কিন্তু এইপর্বে বামদলগুলির দ্বারা সংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে প্রতীকী ধর্মঘটে (যা মূলত তাদের অর্থনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত) চটকল শ্রমজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মতো। এই প্রতীকী ধর্মঘটে তাদের অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে এক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধি বা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার আশাই তাদের সক্রিয় করে তুলেছিল, অথচ ২০১১ পর সমগ্র চটকল অঞ্চলে তৃণমূল ও ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতায়নের পর চটকল অঞ্চল জুড়ে বিজেপির প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

১৯৮১ সালে পৌর নির্বাচন সার্বিক ভোটাধিকারের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতিতে হিন্দীভাষী শ্রমজীবী মানুষদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চটকল শ্রমজীবীদের অবস্থান খুব স্পষ্ট ছিল। তারা মিল অভ্যন্তরে লাল ঝাণ্ডা হাতে তাদের অর্থনৈতিক হকের লড়াই লড়লেও, মিল বহির্ভূত স্থানীয় রাজনীতিতে লাল ঝাণ্ডাকে তেমন গুরুত্ব দিত না। ভাটপাড়া পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। পৌরসভা স্তরে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। ভাটপাড়া পৌরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডে হিন্দীভাষী শ্রমজীবীরা নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮১ সালে ভাটপাড়ায় মোট ২৫টি ওয়ার্ড ছিল যার মধ্যে ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২২ নং ওয়ার্ড মূলত হিন্দীভাষীরা কাউন্সিলার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ১৯৮১ সালের পৌর নির্বাচনে সি.পি.আই.এম দল ১৮টি, এস.ইউ.সি ২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, বিজেপি ১টি ও ৩টি আসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী দখল করে। সি.পি.আই.এম এর ১৮ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ১৩ জন বাংলাভাষী, ৩জন হিন্দীভাষী মুসলিম, ২ জন হিন্দীভাষী হিন্দু প্রার্থী ছিল। সি. পি.আই.এম, এস.ইউ.সি ও ফ. ব্ল. এই তিন বাম ঘেঁষা দলের মিলিত আসন ছিল ২১ টি যার মধ্যে মাত্র ৯টি হিন্দীভাষী প্রভাবাধীন ওয়ার্ডের ৫টি তে তারা জয়ী হয়। বাকী ৪টির ৩টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী ও ১টি আসন বিজেপি দখল করে। মনে রাখতে হবে বামপন্থীদের হাত ধরেই পৌর নির্বাচনে শ্রমজীবীরা সার্বজনীন ভোটাধিকার পাওয়ায় এই পর্বে বামপন্থীরা হিন্দীভাষী প্রভাবাধীন অঞ্চলে বেশ সাফল্য লাভ করে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে সেই ৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসনই (যা মুসলিম প্রধান আসন) বামপন্থীরা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বাকি ৭টির মধ্যে ৫টি কংগ্রেস ও ২টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী জয়ী হয়। ১৯৯০ সালের পৌর নির্বাচনে উক্ত ৯টি আসনের মধ্যে বামপন্থীরা ৫টি পুনর্দখল

করতে সক্ষম হলেও কংগ্রেস উক্ত অঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ১৯৯৫ সালে ভাটপাড়া পৌরসভার আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করে ৩৫টি করা হয় যার মধ্যে ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২২ ওয়ার্ড ছিল হিন্দীভাষী প্রভাবাধীন। উক্ত নির্বাচনে বামফ্রন্ট মাত্র ৪টি হিন্দীভাষী প্রভাবাধীন আসন দখল করতে সমর্থ হয়। ২০০০ সালের এই আসন সংখ্যা কমে ৩টি হয় এবং ২০০৫ ও ২০১০ এও এই ধারা অব্যাহত থাকে।[৪৬]

একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় ভাটপাড়া সংলগ্ন চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত অন্যতম মিউনিসিপ্যাল গারুলিয়ার স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ করা জরুরী। ১৭ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে তৎকালীন গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালের পৌরপ্রধান কেদার সিং এর আকস্মাৎ মৃত্যু হলে ৭ই জানুয়ারি ২০০৩ সালে পৌরসভার নতুন পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন তাঁরই পুত্র সুনীল সিং। নির্বাচনে সুনীল সিং এর নাম প্রস্তাবিত করেন কংগ্রেসের নেত্রী ঊষা চৌধুরী এবং তা সমর্থন করেন তৃণমূলের নেতা রমেন দাস। দ্বিতীয় কোন নাম প্রস্তাবিত না হলে, সুনীল সিং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন।[৪৭] কিন্তু দেড় বছর যেতে না যেতে কংগ্রেস দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত শুরু হয় এবং ২৫শে জুলাই ২০০৪ সালে সুনীল সিং (কংগ্রেস নেতা) এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য যে মিটিং অনুষ্ঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচনে দেখা যায় সুধীরচন্দ্র পাল (সি.পি.আই.এম. নেতা) অমল চট্টোপাধ্যায়ের (সি. পি.আই.এম. নেতা) নাম প্রস্তাবিত করেন, যা সমর্থন করেন নিমাই সাহা (ফ. ব্লু.) অন্য দিকে রমেন দাস (তৃণমূল) অশোক সিং (বি.জে.পি. নেতা) এর নাম প্রস্তাবিত করেন, যা সমর্থন করেন বাবন সিং (কংগ্রেস)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত ভোটে কংগ্রেস নেতা সুনীল সিং কাউন্সিলারদের কাছে সি.পি.আই.এম. নেতা অমল চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন। গারুলিয়া পৌরসভায় বামফ্রন্টের সদস্য মাত্র ৭টি হলেও উক্ত ভোটে অমল চট্টোপাধ্যায় ভোট পান ১৩টি (৭টি বামফ্রন্ট, ৩টি কংগ্রেস- ঊষা চৌধুরী, মনিদীপা বসু, তাপস চৌধুরী, ২টি তৃণমূল বাসন্তী নাথ, বিভা চৌধুরী এবং একটি কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বীণা চৌধুরীর ভোট পান) আর অশোক সিং (বিজেপি) ভোট পান মাত্র ৮টি। ফলে ওই মিটিং এ সভাপতিত্ব করেন অমল চট্টোপাধ্যায়। উক্ত মিটিং-এ অনাস্থা প্রস্থাব ১৩-৮ ভোটে পাস হয়। স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের পৌরপ্রধান সুনীল সিংকে উক্ত পদ থেকে অপসারণের জন্য কংগ্রেস ও তৃণমূলের এক অংশ বামফ্রন্টের সাথে আঁতাত তৈরি করে।[৪৮] বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় পরবর্তী পৌরপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন দলের অবস্থান লক্ষ্য করার মধ্য দিয়ে। ৮ই আগস্ট ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পৌরপ্রধান নির্বাচনে যেখানে কংগ্রেস নেতা বাবন সিং পৌরপ্রধানের জন্য সুনীল সিং এর নাম প্রস্তাব করেন, যা সমর্থন করেন তৃণমূল নেতা রমেন দাস, অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা তাপস চৌধুরী প্রস্তাব করেন ঊষা চৌধুরীর নাম, যা সমর্থন করেন তৃণমূলের নেত্রী বাসন্তী নাথ। উক্ত ভোটে ঊষা চৌধুরী ১২টি ভোট লাভ করেন এবং সুনীল সিং ৯ টি ভোট পান। অর্থাৎ

অনাস্থা ভোটের সামগ্রিক চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে পৌরপ্রধান নির্বাচনে, শুধু মাত্র একটি ভোট ফিরে পেয়েছিল সুনীল সিং। ফলে উক্ত নির্বাচনে ঊষা চৌধুরী নতুন পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন।[৪৯] গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালের ইতিহাসে তিনি একমাত্র মহিলা যিনি এই পদে আসীন হন। পরবর্তীকালে নির্দল প্রার্থী তথা সম্পর্কে সুনীল সিং এর দাদা চন্দ্রভান সিং এর একটি ব্যঙ্গাত্মক চিঠিতে ঊষা চৌধুরীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও বাম কাউন্সিলারদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত পৌর প্রধান হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন।[৫০] পুরো ঘটনাবলী থেকে এ কথা স্পষ্ট ভিন্ন আদর্শ তথা মতাবলম্বী কাউন্সিলাররা পরিস্থিতি তথা অবস্থা অনুসারে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে দ্বিধা বোধ করত না। এমনকি ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে নিজের দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বামপন্থীদের সাথে আঁতাত করতেও এদের দেখা যায়। সমগ্র চটকল অধ্যুষিত মিউনিসিপ্যালগুলির রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি কমবেশি এরকমই ছিল।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস সর্বদাই পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে এবং একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রটির সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। একইভাবে শ্রমিক ইতিহাসকে সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা হয়, তাহলে শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টি সামাজিক ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এইভাবে শ্রমিক একজন ব্যক্তি হিসাবে ধ্রুপদী অর্থনৈতিক ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিষয় হয়ে ওঠে।

পৌলা এস ফাস তাঁর প্রবন্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে যে তাত্ত্বিক সংযোগের কথা বলেছেন চটকল শ্রমিকদের ব্যক্তি পরিচয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফাসের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা থেকে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল ১৯৭০ এবং ৮০ এর দশকে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছিল সেখানে গোষ্ঠীর আচরণগত প্রবণতা নিয়ে কোন আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। সামাজিক ইতিহাসবিদরা মূলত গোষ্ঠী বা দলের যৌথ একমাত্রিক নিজস্ব বিশ্বাস বা চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল, কিন্তু গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে উপেক্ষা করেছিল। এটি করতে গিয়ে ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসও এই ধরনের ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়। একটি স্রোতের অংশ হিসাবে ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর সমার্থক হিসাবে দেখা হয়, সেখানে তার ব্যক্তিগত পরিচয় বা সত্তা, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস তথা কার্যকলাপ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। ব্যক্তিসত্তার আলোচনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই যে শূন্যতা, তা পূরণ করার কাজে এগিয়ে আসে সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সেদিক থেকে চটকল শ্রমিকদের ব্যক্তি সত্তার ইতিহাস অনুসন্ধান সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

সামাজিক ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটিকে আগে থেকে অনুমান করে নেয়। তাছাড়া প্রাথমিক পর্বের সামাজিক ঐতিহাসিকরা কোন ঘটনা বা তার সাথে সম্পৃক্ত সমষ্টির কেন্দ্রীয় ও স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে সাধারণ প্রবণতা হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেই সাধারণীকৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত প্রবণতা যা কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্তরালে অব্যাখ্যায়িত থেকে যায় সেগুলিকে চিহ্নিত করার ছিদ্র খুঁজে দেয় তাদের একান্ত নিজস্ব আখ্যানের মধ্যে দিয়ে। সেদিক থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদরা ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা-এ রচিত আখ্যানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে থাকে। এই ভাষা এবং আখ্যানের ব্যবহার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উত্তর আধুনিক চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে দেখা যেতে পারে।[৫১]

মানুষের এই আবেগকে তত্ত্বায়িত করার কাজটি করেছিলেন রব বডিস। রব বডিস তাঁর গ্রন্থে ব্যক্তি আবেগকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই আবেগ একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের শরীর এবং মন জুড়ে প্রকাশ পায়, যা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের অভিজ্ঞতা এবং তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে। বডিস আরও দেখিয়েছেন কোন একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি হয়তো পরস্পর থেকে ভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধম্যে একই ধরনের আবেগের শিকার হয়।[৫২] এপ্রসঙ্গে রজত রায়ের লেখা ফেল্ট কমিউনিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জনপ্রিয় মানসিকতাগুলিকে অন্বেষণ করে এই বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত চেতনা এবং তার সম্মিলিত আবেগ উভয়কেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তিনি বিদ্রোহে কারণ হিসাবে দেখান, হিন্দু ও মুসলিম দুই পৃথক জাতিগোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা অত্যাচারের মধ্য দিয়ে একই ধরনের আবেগের শিকার হয় যা পরবর্তীতে তাদের পৃথক সাংস্কৃতিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। জনগণের আবেগ যা তাদের ভাষা ও ভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তারই সাহায্যে ১৮৫৭ এর বিদ্রোহকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যা নিছক রাজনৈতিক ঘটনাক্রম বা কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[৫৩] অর্থাৎ ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত আবেগ কোন বৃহত্তর পরিবর্তন বা আন্দোলনেরও সূত্রপাত করতে পারে। আমাদের আলোচ্য শ্রমিক ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সম্মিলিত আবেগের ফলে তীব্র আন্দোলন ও ধর্মঘটের সাক্ষী যেমন এই চটকলগুলি ছিল, তেমনই ব্যক্তি স্তরে সেই আবেগের নানান বহিঃপ্রকাশ এবং তার আখ্যানও শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে কোন শ্রমিকের ব্যক্তিগত আবেগ গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত আবেগকে ছাপিয়ে গিয়ে তাকে যে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে তার একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শ্রমিক ইতিহাসের বিভিন্ন নথি ও আখ্যানে। শ্রমিক শুধুমাত্র উৎপাদনের যন্ত্র নয় তারাও মানুষ, তাদেরও পরিবার আছে, তাদেরও ব্যক্তি

পরিসর থাকতে পারে, মানুষ হিসাবে তাদের চাওয়া পাওয়া আছে যা গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণী বা কৌম চেতনার মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ সম্ভব নয়।

এপ্রসঙ্গে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত কিছু প্রবাদ তাদের ব্যক্তিসত্তার ভিন্ন রূপ তুলে ধরে। বাংলায় আগমনে প্রথম যুগ থেকেই শ্রমিকদের দেশের বাড়ি ফিরে যাওয়ার এক সাধারণ চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মিলের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তির জন্য তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (বিশেষত মার্চ- এপ্রিল- জুন) গ্রামে যাওয়ার উদ্যোগ নিত। এছাড়া বাড়িতে বিবাহ, মৃত্যু বা অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য তারা ছুটির আবেদন করত। কিন্তু ছুটি পাওয়া সহজ ছিল না। এপ্রসঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত একটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে-

"কওয়ান সঙ্কট ধনি পরলে ত অইসন বিয়োগ লিখে,
দেহু না সাহেব হমকে তলবিয়া, ত হমহু ঘর যইবো।"[৫৪]

অর্থাৎ কোন সংকট পড়ল যে এমন বিয়োগান্তক চিঠি লিখেছ, সাহেব মাইনে দাও, যাতে আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। গ্রামে সঙ্কটকালে নিজ পরিবারের পাশে না থাকতে পারায় বা মিলে একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তির আশায় তারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত। দেখা দিত মিল মালিকের সাথে তাঁদের সংঘাত। বজবজ মিলের ২৮ জন শ্রমিকদেরকে নিয়ে ১৯০৬ এ কোনও এক বাঙালি আইনজীবীর দ্বারা লিখিত চিঠি থেকে ছুটিকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের কিছু বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়- "আমাদের ছুটির জন্য সাহেবদের কাছে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু ছুটিতে যাওয়ার সময় আমাদের বাবু ও সর্দারদের ঘুষ দিতে হয়। এর জন্য আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেক মাস ঘুষ নেওয়া হয় এমনকি দুর্গাপূজার সময়ও। যদি আমরা ঘুষ না দি, তাহলে উনারা আমাদের ওপর ভালো করে কাজ না করার আরোপ লাগিয়ে সাহেব দিয়ে আমাদের ওপর জরিমানা লাগায় অথবা চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়।"[৫৫] শ্রমিকদের ব্যক্তিসত্তা যখনই আঘাত পেয়েছে তখনই তারা প্রতিবাদী রূপ ধারণ করেছে।

অন্যদিকে তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক চাহিদা, পরিবারের ভরণপোষণ ইত্যাদি পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা তাদের মিল মালিকদের চরম অত্যাচার সহ্য করতে শক্তি প্রদান করত। এই ধরনের চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয় 'চুম-চটাকী' নামক ভোজপুরী লোককথা থেকে। যেখানে বলা হচ্ছে "নগর মে ধন কে লিয়ে পুরুষ আপনে শেঠ কে পাঁচ লাত ভি সহর্ষ স্বীকার করতা হ্যা। ওহ সোচতা হ্যা কি ইয়াহা হমে কোন পহচানতা হ্যা? ভলে পাঁচ লাত পরেঙ্গে, অপমান হোগা কিন্তু রুপয় ত মিলেঙ্গে।"[৫৬] অর্থাৎ শহরে টাকার জন্য শ্রমিক নিজের মালিকের পাঁচটি কথাও খুশি খুশি শুনে নিতে পারে। সে ভাবে এখানে তাকে কেই বা চেনে? পাঁচটা কথা শুনলেও, অপমানিত হলেও টাকা তো পাওয়া যাচ্ছে। কথাগুলো থেকে ব্যক্তিস্বার্থ স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। শেখর যোশীর লিখিত অপর একটি গল্প 'জী-হজুরিয়া'তে দেখা যায়, গনপতলাল জী-হজুরিয়া নামে পরিচিত,

এমনকি এই নাম এতই জনপ্রিয় যে, সে নিজেই নিজের আসল নাম ভুলে গেছে। এই নাম হওয়ার পেছনে জানা যায়, সবাইকে ম্যানেজ করে চলার জন্যই সকলে তাকে এই নামে ডাকে। অর্থাৎ নিজের কাজ বের করিয়ে আনার জন্য পরিস্থিতি অনুসারে গনপত নিজের অবস্থান বদলায়।[৫৭] মিলের অভ্যন্তরের এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে যখন একজন ব্যক্তি একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে যার প্রধান কারণ হল সমস্যার সময় কোন এক ট্রেড ইউনিয়ন তো পাশে দাঁড়াবে। ফলে যখন এই শ্রমজীবী মানুষ চটকলগুলিতে দলে দলে যোগ দেয় ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে তখন কোথাও না কোথাও তাদের এই ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করে, অথচ তাদের এই ব্যক্তিসত্তা ইতিহাসের পাতায় কোন স্থান পায় না।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদরা গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে আপাতভাবে তাৎপর্যহীন মানুষদের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার ইতিহাস অনুসন্ধানের সুযোগ করে দেয়। একজন শ্রমিক শুধু শ্রমিক নয় সে একজন বাবা বা একজন স্বামী, তার চোখের সামনে যখন দিনের পর দিন তার সন্তান, তার স্ত্রী নিরন্ন অবস্থায় দিন কাটায় তখন সে আত্মগ্লানিতে ভোগে। নিরুপায় সেই শ্রমিককে আত্মহত্যা করতেও দেখা যায়। শ্রমিকদের জীবনে এই ব্যক্তি চেতনার বহিঃপ্রকাশ আরও সুস্পষ্ট হত যদি তাদের লিখিত কিছু উপাদান পাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন লেখনীর যথেষ্ট অভাব আছে। তবে এর মধ্যে বজবজের চিভিয়ট জুট মিলের শ্রমিক গিয়াসউদ্দিনের লেখা পত্র থেকে এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৭৬ থেকে প্রায় চার দশক চটকলের শ্রমিকরূপে কর্মরত গিয়াসউদ্দিন শ্রমিক আন্দোলনের অনেক রং-ই দেখেছে। অবসর জীবনে তিনি লেখালেখির সাথে যুক্ত হন এবং 'শ্রমিকদের হাতিয়ার' পত্রিকা বার করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে ২৩ বছর বয়সী গোন্দলপাড়া জুটমিলের শ্রমিক দীপক দাসের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে তিনি শ্রমিকের হাতিয়ার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লেখেন 'এক শ্রমিকের আত্মহত্যা' নামে। যেখানে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা প্রসঙ্গে স্বার্থের ভিন্নতাকে দায় করেছেন। তাঁর ভাষায়-'আমরা যারা পার্মানেন্ট শ্রমিক ছিলাম, তাঁরা কি বদলি-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের সমস্যাকে সমস্ত শ্রমিকদের সমস্যা হিসাবে দেখে তা সমাধানের পথ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি? পিছন ফিরে দেখলে মনে হয়, না, করি নি। এইখানেই তেইশ বছরের দীপক দাসের আত্মহত্যা আমাকে অপরাধী চিহ্নিত করে যায়।'[৫৮] একবিংশ শতকে যখন চটকল শ্রমিকদের স্থায়িত্ব ও নিয়োগের ধরন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমানে স্থায়ী ও বদলি শ্রমিকের স্থানে ৬ থেকে ৮ ধরনের শ্রমিকের অস্তিত্ব বর্তমান সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাত যে আরও তীব্র হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৯৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় বজবজ জুটমিল বন্ধ হওয়ায় সেখানকার ১৩ জন শ্রমিক, বালী জুটমিলে ২ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করে। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫৯]

গোষ্ঠীগত বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা গোষ্ঠীস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থ উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা না টেনে সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদরা উত্তর আধুনিকতাবাদের চিন্তাসূত্র ধরে ব্যক্তিসত্তাকে 'Fluid and changing' বলে চিহ্নিত করেছেন, যা পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে পরিবর্তন হওয়া খুব আশ্চর্যের নয়। চটকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রমিকরা মিল অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও, কমিউনিস্ট মতাদর্শে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী তা কিন্তু নয়। তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মিলের বাইরে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। কমিউনিস্টরা নাস্তিক হলেও, শ্রমিকরা তাদের পাড়া জুড়ে একাধিক দেবদেবীর আরাধনা থেকে শুরু করে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তি পরিসরে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে নাকচ করে দেয়। শুধু তাই নয় মিল অভ্যন্তরে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি তাদের ব্যক্তিস্বার্থের বহুমুখীনতারই ইঙ্গিত দেয়। 'বি.টি. রোডের ধারে' নামক উপন্যাসে দেখা যায়, শ্রমিকরা শ্রেণী হিসাবে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে, অধিকার সম্বন্ধে যেমন সচেতন, তেমনি ব্যক্তিগত অজস্র কলহে ঈর্ষায় তাঁরা ছিন্নভিন্ন। রুজি-রুটি-আস্তানার মতো জীবনের বাস্তব প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে তাঁরা যতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তেমনি সেগুলিকে ভুলে গিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতেও তাঁরা উদ্দাম।[৬০] ঋত্বিককুমার ঘটকের রচিত 'কমরেড' নামক ছোটগল্পেও ঝাব্বু নেতার ব্যক্তিস্বার্থ কিভাবে কলের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামকে সমাপ্ত করতে চলেছিল, তার এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও অবশেষে তারই সঙ্গী সাথী শ্রমিক লালবাহাদুর আন্দোলনকে জীয়ে রাখার জন্য তার হত্যা করে।[৬১] গল্প, উপন্যাসগুলির ইতিবাচক পরিসমাপ্তি ঘটলেও, চটকল শ্রমজীবীদের সংগ্রামী জীবনে অনিল, ঝাব্বুর মত শ্রমিক নেতার পাশাপাশি সাধারণ কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যক্তিস্বার্থ উঁকি মারত, যার জন্য একাধিক আন্দোলন তার পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

সমগ্র আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, চটকল শ্রমজীবীদের কোন একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। পরিস্থিতি অনুসারে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান তাদের মধ্যে বহু মাত্রিকতারই ইঙ্গিত দেয়। একদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে শ্রেণী হিসাবে তাদের আন্দোলন সংগ্রামের ঐতিহ্য যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সেই ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীধারণার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ ক্রমশ উঁকি মারতে থাকে, যা অনেক সময় শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে তৎপর হয়। এই গোষ্ঠীও কিন্তু কোন একমাত্রিক চরিত্র নিয়ে বজায় থাকে না বরং এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও সংকীর্ণতর ব্যক্তিস্বার্থ বা আবেগ প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে, যা মূলত তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে চটকল শ্রমিকদের বহুমাত্রিক চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একদিকে তারা শ্রেণী রূপে নিজের অধিকার বুঝে নিতে

তৎপর হয়, আবার মিল বহির্ভূত রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষত স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও ভাষাকে কেন্দ্র আবেগ দেখা যায়। মিলের অভ্যন্তরে লিঙ্গভিত্তিক বিভেদও সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্ন ধরনের চেতনা পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে ক্রিয়াশীল হলেও, এ সমস্ত বিষয় সাথে জড়িয়ে থাকে তাদের ব্যক্তি চাহিদা তথা ব্যক্তি চেতনা। এই ব্যক্তি চেতনাই সব শেষে তাদের বিভিন্ন পরিচিতিকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে, সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে এই চেতনার প্রতিক্রিয়ার ওপর তাদের চরিত্র নির্ভর করে।

সমাপ্তিসূচক মন্তব্য

ঐতিহাসিকদের ভিন্ন আঙ্গিক শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের শ্রেণী ধারণা যেমন তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে, তেমনি নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদদের কৌম চেতনা কেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা শ্রমিকদের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। পরবর্তীকালে এইগুলির সাথে লিঙ্গ, ভাষা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি প্রশ্ন সংযুক্ত হয়ে শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এগুলি সবই শ্রমজীবীদের জীবনের বিশেষ কোন দিক বা অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে থাকে। সামগ্রিকভাবে মানুষ হিসাবে শ্রমজীবীদের জীবন অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধাধরা ছকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন বা একাধিক শ্রমিক যেমন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি একই সময় তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিভাজনও কাজ করে। শুধু তাই নয় নারী-পুরুষের মত প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভিন্ন অবস্থা বা ক্ষেত্রবিশেষে। শ্রমিকশ্রেণীর এই বহুমাত্রিক চরিত্র বা অবস্থান অধুনা ইতিহাসে বহুল চর্চিত বিষয় হলেও, এর আনুসাঙ্গিক কারণ অনুসন্ধান তেমন গুরুত্ব পায় না। চটকল শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবনে (বিশেষ করে হিন্দীভাষী হিন্দু চটকল শ্রমিক) এই বহুমাত্রিকতার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় সেই প্রাক স্বাধীনতা পর্ব থেকেই। ১৮৮০ এর দশক থেকেই বাংলায় তাদের আগমন লক্ষ্য করা গেলেও প্রায় এক'দশক সময় লেগেছিল তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে সুসংগঠিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। প্রাথমিকভাবে তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের রাশ মূলত বামপন্থীদের হাতে থাকলেও, তারা সমগ্র সময়পর্ব জুড়ে যে তাদের প্রতি অনুগত ছিল তা কিন্তু নয়, যখনই বামপন্থীরা আন্দোলনের পথ থেকে সরে সমঝোতার পথে হেঁটেছে তখনই এই শ্রমজীবীরা তাদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে, এককথায় বলতে গেলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকুল সবকিছুই তারা গ্রহণ করেছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী দল বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করেছে।

সমগ্র সময়পর্ব জুড়ে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবীদের মধ্যে শ্রেণী

চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও, সেই একই পর্বে তাদের মধ্যে কৌম চেতনারও উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনের বাইরে এক বৃহত্তর ক্ষেত্র হল সামাজিক জীবন। এই জীবনের হিসেবনিকেশ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এখানে তারা শ্রেণীর চাইতে ভাষা, আঞ্চলিকতা, ধর্ম, জাত, বর্ণ তথা লিঙ্গ ভিত্তিক ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১. প্রকাশ কারাত, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ, এন.বি.এ., কলকাতা, ২০১১।

২. Prabhat Patnayak, 'Notes on the Concept of Class', Article in Social Scientist, Sep-Oct, 2000, বাংলায় অনুবাদ, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শ্রেণী: কয়েকটি কথা, এন.বি.এ., কলকাতা, ২০০৩।

৩. পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট, ভারতে নয়টি উদারনীতির আক্রমন, শ্রমিক শ্রেণী, নাগরিক জীবন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সি.পি.আই. (এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, ২০১৭।

৪. Subho Basu, Does Class Matter? Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal 1890-1930s, Oxford University Press, 2004, P- 275.

৫. Amarya Sen, Eric Hobsbawn Memorial Lecture, May, 2015, এবং 'মার্ক্সের চিন্তার নানা দিক', দেশ পত্রিকা, ২রা নভেম্বর, ২০২০, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রাণা কৃত সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।

৬. দীপেশ চক্রবর্তী, 'সাম্প্রতিক ইতিহাস ভাবনা: আমার ইতিহাসের আলপথ ধরে' (প্রবন্ধ), মনোরথের ঠিকানা, কলকাতা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৮।

৭. বিপান চন্দ্র, আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ৩৮-৩৯।

৮. দীপেশ চক্রবর্তী ও রণজিৎ দাশগুপ্ত, উনিশ শতকে বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক, অনুবাদক- অনির্বাণ মণ্ডল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯, পৃষ্ঠা- xvii।

৯. রুশো, সামাজিক চুক্তি, অনুবাদক- শ্রী ননীমাধব চৌধুরী, বালিগঞ্জ প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা- ৪।

১০. শঙ্কর ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১০৮-৯।

১১. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি ১৮৫০-১৯৪৭, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড,কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০।

১২. বি. ফলি, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯০৬, পৃষ্ঠা-৮।

১৩. দীপেশ চক্রবর্তী ও রণজিৎ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত।

১৪. দীপেশ চক্রবর্তী ও রণজিৎ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-xix-xx।

১৫. Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History, Princeton University Press, Princeton, 1989.

১৬. I.B. Report, Sl. No-367, File No-970/47, File Name- Krishna Sukul, State Archive, Shakespeare Sarani.

১৭. Subho Basu, Ibid, P-274.

১৮. Sumit Sarkar, From Class Struggle to Identity Politics, Problematising a Transition, The Calcutta Historical Journal, Vol- XIX and XX (Combined), 1997-98, p-5.

১৯. দীপঙ্কর গুপ্ত, টনতুন সমাজ, নতুন সমাজদর্শন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১/১০/২০২০, also Jonthan Parry, Classes of Labour, Social Science Press, Delhi, 2019.

২০. 'চটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি', বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১১।

২১. Ranajit Das Gupta, Labour and Working Class in Eastern India-Studies in Colonial History, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1994, P.p- 350.

২২. অমল দাস, 'গত শতাব্দীতে বাংলার চটকল শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের কিছু কাহিনী', বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৩।

২৩. বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন ৪১, হারিসন রোড, কলিকাতা।

২৪. স্মরণিকা, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, প্রাগুক্ত।

২৫. Ranajit Das Gupta, Ibid, p- 425.

২৬. বাণিজ্য বিভাগের ফাইল নং ৩সি-১ এপ্রিল-১৯৩০ নং ১৩-১৮।

২৭. বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন প্রধান কার্যালয়, ৪১, হ্যারিসন রোড, কলিঃ কালী সেন, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক যুগবার্তা প্রেস, ছকু খানসামা লেন থেকে মুদ্রিত, ৪১, হ্যারিসন রোড থেকে প্রকাশিত।

২৮. Nirban Basu, The Working Class Movement, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1994.

২৯. ড. নির্বাণ বসু, 'প্রাক স্বাধীনতা বাংলার চটকলের দুটি সাধারণ ধর্মঘট ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে', স্মরণিকা, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৪ ।

৩০. Nirban Basu, op.cit., P-71.

৩১. Edt. Subodh Roy, Communism in India- Unpublished Document 1935-1945, National Book Agency (P) Ltd, 1976, Calcutta, P- 287.

৩২. Bengal Politics Document of the Raj, Vol-2, The University Press Limited, Dhaka, P-135.

৩৩. শত্রুঘ্ন কাহার, 'স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে চটকল শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবন, প্রসঙ্গ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল', ইতিহাস এষণা-৩, সম্পাদনা- সিদ্ধার্থ গুহ রায়, কলকাটা, ২০২১, পৃষ্ঠা-৩০২।

৩৪. I.B Report, Sl No- 259, File No- 456/47, File name- INTUC, Shakespeare Sarani, West Bengal Archive.

৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শুধু দাবি, শুধু চাপ', ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, রিল নং- ১৭৯, ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।

৩৬. নির্বাণ বসু, 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলার শ্রমিক আন্দোলন', অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, নির্বাণ বসু সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা,২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫২.

৩৭. Anna Sailer, Workplace relation in Colonial Bengal, The Jute Industry and Indian Labour 1890s-1930s, Bloomsbury Academic, UK, 2022.

৩৮. আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধের ১ম অধ্যায় আমি তা উল্লেখ করেছি এবং বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় Nirban Basu, The Working-Class Movement; A Study of The Jute Mills of West Bengal, 1937-47, ibid, Pp-145-47.

৩৯. Anna Sailer, 'Spinners', 'Madrassis' and 'Hindus': Jute Workers' Strikes in Titagarh in the Late 1930s, South Asia Chronicle 6/2016, page- 11-12.

৪০. Leela Fernandes, 'Displacing Women Workers on the Margins of Working-Class Politics in the Jute Mills', Etd- Arjan De Haan and Samita Sen, A case for labour history the jute industry in Eastern India, K P Bagchi & Company, Kolkata, 1999, P- 185.

৪১. সাক্ষাৎকার, শিউপুকার উপাধ্যায়, মেঘানা জুট মিল কোয়ার্টার, তারিখ- ০৮/০১/২০২০।

৪২. সাক্ষাৎকার, অর্জুন সিং, এম.পি, বি.জে.পি., তারিখ-20/08/2021, স্থান শ্রমিকভবন, ভাটপাড়া।

৪৩. Sir Lewis Namier, The Structure of Politics, Macmillan, London, 1929, p- 90-91.

৪৪. ইজমা বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮১, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৬।

৪৫. চিত্তব্রত মজুমদার, 'পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী ফলাফলের গতি প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা', সরোজ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মার্কসবাদী পথ, নবম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৩২।

৪৬. ভাটপাড়া মিউনিসিপাল নির্বাচন ফলাফল, ১৯৮১ থেকে ২০১০।

৪৭. Garulia Municipla Resolution Book No- 12, 26-03-2002- 03.06.2005, Page-139, Dated- 07.01.2004

৪৮. ibid, Page-339-42, Dated- 25.07.2004

৪৯. ibid, Page-396-97, Dated- 08.08.2004.

৫০. ibid, Page-402-405, Dated- 31.09.2004

৫১. Paula S. Fass, Cultural History/Social History; some Reflections on a Continuing Dialogue, Journal of Social History, Vol. 37, No. 1, Special issue (Autumn, 2003) Pp. 39-46.

৫২. Rob Boddice, The History of Emotions, Manchester University Press, 2018,

Introduction.

৫৩. Rajat Kanta Ray, Felt community, Oxfort University Press, New york, 2003, p-31-39.

৫৪. শ্রীধর মিশ্র, भोजपुरी लोक-साहित्य: सांस्कृतिक अध्ययन, হিংদুস্তানী অকাদমী, প্রযাগ, 1971, পৃষ্ঠ-183।

৫৫. Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History, Princeton University Press, ibid, P-107।

৫৬. শ্রীধর মিশ্র, পূর্বোক্ত।

৫৭. शेखर जोशी, डंगरी वाले, সাহিত্য ভংডার, ইলাহাবাদ, 2014, পৃষ্ঠ-67।

৫৮. পাটকল থেকে দুনিয়াদারি গিয়াসউদ্দিনের লেখার নির্বাচিত সংকলন, সম্পাদক-বিপ্লব নায়ক, প্রকাশক- অন্যতর পাঠ ও চর্চা, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮।

৫৯. পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত শ্রমিক, নাগরিক মঞ্চের বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৬০. ড. কৃষ্ণা হোতা (পাল), সমরেশ বসুর উপন্যাস ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা-১০৯।

৬১. ঋত্বিককুমার ঘটক, কমরেড, সৌমিত্র লাহিড়ী সম্পাদিত- শ্রমজীবী মানুষের গল্প, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪৬৫-৪৭১।